নেতা যে রাতে নিহত হলেন ◆ ইমদাদুল হক মিলন

KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ

www.kathaprokashbd.com

9 847012 006450

নেতা যে রাতে নিহত হলেন

ইমদাদুল হক মিলন

নেতা যে রাতে নিহত হলেন

নেতা যে রাতে নিহত হলেন

ইমদাদুল হক মিলন

কথাপ্রকাশ

নেতা যে রাতে নিহত হলেন

কথাপ্রকাশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
স্বত্ব : লেখক
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
Email : jashimuddin1969@gmail.com
ফোন ০১৭৬৬৫৯০৪০৪

প্রধান কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮৪৪৩৬, ৯৫৮৯৮৫২

প্রাপ্তিস্থান
কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
এবং
কথাপ্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ফোন ৯৬৩৫০৮৭

মুদ্রক
সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৩৩০২৯, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

মূল্য : ২৫০.০০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

NETA JE RATE NIHOTO HOLEN by Imdadul Haq Milan
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 37/1 Banglabazar, Dhaka 1100, Ph. 9581942, 01766590404
Kathaprokash Print : February 2017
Price : Tk. 250.00
Email : kathaprokash@gmail.com, Web : www.kathaprokashbd.com

ISBN : 984 70120 0645 0

উ ৎ স র্গ

আসাদুজ্জামান নূর
দেশ আলোকিত করা মানুষ

সূচি

উনিশ শো একাত্তর ॥ ৯
রাজার চিঠি ॥ ১৬
প্রস্তুতিপর্ব ॥ ২৫
পরবর্তীকাল ॥ ৩৭
মানুষ কাঁদছে ॥ ৪৬
ছোছা কদম ॥ ৬৬
রতনপুরের সূর্যমুখী ॥ ৭৮
লোকটি রাজাকার ছিল ॥ ৯০
প্রবাসে এক বাঙালি ॥ ৯৯
রতন মৃধার বাংলাদেশ ॥ ১১২
সাড়ে তিন হাত ভূমি ॥ ১১৮
একটি মুখের হাসির জন্য ॥ ১২৫
নেতা যে রাতে নিহত হলেন ॥ ১৪১
যমুনা ॥ ১৪৭

উনিশ শো একাত্তর

একদিন দুপুরবেলা দীনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একাত্তর সালের কথা। বর্ষাকাল। সেদিন টানা দশ দিন পর দীনুদের ছোট্ট মফস্বল শহরে দুপুরের দিকে রোদ উঠেছে। এ কদিন ছিল বৃষ্টি। ঘোর বৃষ্টি। সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। আকাশ ছিল পোড়া মাটির চুলোর মতো। থেকে থেকে মেঘ ডেকেছে, বিদ্যুৎ চমকেছে। আর বৃষ্টি। নিঝুম বৃষ্টি! শহরের চারদিকে ছিল বর্ষার জল। জলের ওপর মাইলকে মাইল ভেসে ছিল আমন ধান। ধানে তখন থোড় আসার সময়। বৃষ্টি ছিল, বাতাস ছিল না বলে বৃষ্টির তলায় ধানি মাঠগুলো ছিল স্বপ্নের মতো স্থির। তখন সুবলদের বাড়ির বাংলাঘরে থাকে দীনু।

সুবলদের বাড়িটা শূন্য পড়ে আছে অনেকদিন। বর্ষার মুখে মুখে সুবলরা বাড়ি ছেড়ে গেল। যাওয়ার দিন সকালবেলা বুড়ি দিদিমা দীনুকে ডেকে বললেন, আমরা চলে যাচ্ছি দীনু। তারপর আঁচলে চোখ মুছলেন।

দীনু কিছু বুঝতে পারে না। দিদিমার চোখে জল দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। টের পায় নিজের চোখও জলে ভরে আসছে তার।

দীনু ছেলেটা এই রকম। কারো চোখের জল সইতে পারে না। জন্মের পর দেখেছে এই মফস্বল শহর, এই সব মানুষ। জগৎ-সংসারে আপন কেউ নেই বলে এই শহরে সবাই তার আপন। কাউকে দীনু ডাকে বাবা, কাউকে মা। ভাই বোন দিদিমা জ্যাঠা চাচা মামা খালা পিসি। আত্মীয়র অভাব নেই দীনুর। আর নিজের কোনো বাড়িঘর নেই বলে এই শহরের সব বাড়িঘরই দীনুর নিজের। যখন যে বাড়ি ইচ্ছে যায়। খিদে থাকলে সোজা গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। ঘুম পেলে যে-কোনো বিছানায় ফাঁকফোকর দিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে। দীনুকে কেউ কখনো ফেরায় না।

দীনুর বয়স দশ বছর। গায়ের রং কালো হলে হবে কী, দীনুর মুখটা বড় সুন্দর; চোখ দুটো বড় সুন্দর। দীনুর চোখের দিকে তাকিয়ে, মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কখনো দীনুর সঙ্গে রাগ করতে পারে। দশ বছর বয়সে দীনুও যে কেমন করে কথাটা জেনে গেছে!

তবে একটা কথাই দীনুর জানা হয়নি, জানা হবে না, দীনু হিন্দু না মুসলমান! কেমন করে এই শহরে এসেছিল, কার কোলে, কেউ তা জানে না। যদিও এ নিয়ে দীনুর কোনো দুঃখ নেই। সুখ আছে। দশ বছরের জীবনেই দীনু জেনে গেছে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ। সে কোন ভাগে?

দীনু জানে না। সুখটা এই, অবাধে সে হিন্দু বাড়ি যায়। মাসি পিসি ডাকে। পেটপুরে খায়, ঘুমায়। যায় মুসলমান বাড়ি। খালা ফুফু ডাকে। পেটপুরে খায়, ঘুমায়। দীনুর কোনো দুঃখ নেই।

তো সুবলের দিদিমা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, দীনু রে আমরা কোলকাতা যাচ্ছি।

কোথায় দিদিমা?

কোলকাতা।

কোলকাতা কোথায়, দীনু জানে না। তার মনে হয় এই শহরের আশপাশেই হবে কোলকাতা, দিদিমারা বোধহয় আত্মীয়বাড়ি যাচ্ছেন বেড়াতে। দু পাঁচ দিন পর ফিরে আসবেন।

দিদিমা তাহলে কাঁদে কেন? দীনু সারা বাড়ির লোকজনের মুখ দেখে। কেমন থমথমে দুঃখী মুখ সবার, আর কত যে বোঁচকা-বুঁচকি! খাট-পালঙ্ক আর ভারী জিনিসপত্র ছাড়া সবই নিয়ে যাচ্ছে সুবলরা। আত্মীয়বাড়ি গেলে কেউ কি এত জিনিসপত্র নিয়ে যায়?

দীনুর মাথার ভেতর বড় রকমের একটা গিঁট লেগে যায়। গিঁট খুলতে দীনু যায় সুবলের কাছে। সুবল দীনুর বয়সি। হলে হবে কি, সুবল বড় বুদ্ধিমান। স্কুলে পড়ে তো!

সব শুনে সুবল বলল, জানিস না দেশে যুদ্ধ লেগেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কত মিলিটারি এসেছে। মিলিটারিরা সব মানুষ মেরে ফেলবে। ইয়া বড় বড় বন্দুক আছে।

শুনে দীনু খুব ভয় পেয়ে যায়। হায় হায়, তাহলে!

তাহলে আর কি! আমরা এজন্যেই চলে যাচ্ছি।

তখন দীনু একটা আবদার করে বসে। সুবল, আমাকে নিবি?

যাহ্, তোকে কোথায় নেব!

এ কথা শুনে সুবলের দিদিমা এগিয়ে আসেন। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে দীনুর মাথায় হাত রাখেন। দীনু দাদা রে, মন খারাপ করিসনে। ওখানে আমাদেরই কোনো ঠাঁই-ঠিকানা নেই। থাকলে তোকে নিয়ে যেতাম।

তারপর আবার আঁচলে চোখ ঢাকেন। দেখে দীনু এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে। মাথা নিচু করে।

দিদিমা বললেন, আমাদের এই বাড়িটা তোকে দিয়ে গেলাম। তোর তো কোথাও থাকার জায়গা নেই। এখানে থাকিস। একা থাকতে ভয় লাগলে কাউকে নিয়ে থাকিস। ঘরে চাল ডাল সব আছে। তোর ছমাস চলবে। আর শোন দাদু, তোর ভয় নেই। তুই এত ভালো ছেলে, এত সুন্দর, তোকে ভগবানও মারতে লজ্জা পাবেন। স্বাধীন হলেই আমরা ফিরে আসব।

দেশ স্বাধীন মানে?

এত দুঃখের মধ্যেও সুবলের দিদিমা হেসে ফেলেন। এই দেশ পূর্ব পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান থাকবে না। হবে বাংলাদেশ।

দীনু হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞেস করত কিন্তু তার আগে খালপাড়ে বিরাট ছইওয়ালা নৌকা এসে ভিড়ল। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে সুবলরা সব নৌকায় গিয়ে উঠল। দীনু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খালপাড়ে। তারপর যতক্ষণ সুবলদের নৌকা দেখা যায়, ততক্ষণ কতবার যে চোখের জল মুছল, গোনা-গুনতি নেই।

সেই দিনটা খুব খারাপ কেটেছে দীনুর। সারা দিন কিছু খায়নি। সুবলদের বাড়ির তিনটা ঘরের চাবিই দীনুকে দিয়ে গিয়েছিলেন সুবলের দিদিমা। দীনু শুধু খুলেছিল বাংলাঘরের তালা।

সুবলদের বাংলাঘরে বিশাল একটা পুরনো কালের চৌকি পাতা। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে। সেই চৌকিতে সারা দিন শুয়ে থেকেছে দীনু। জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশ দেখেছে। সুবলদের কথা ভেবেছে আর মিলিটারিদের কথা। মিলিটারিরা সত্যি কি সব লোকজন মেরে ফেলবে? তাহলে?

এই ভাবতে ভাবতে দীনু ঘুমিয়ে পড়েছে। কখন যে!

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দীনু খুব ভয় পেয়ে গেল। প্রথমে খানিকক্ষণ সে বুঝতে পারে না, কোথায় শুয়ে আছে। যখন বুঝতে পারল সুবলদের বাংলাঘর, ভয়টা শুরু হলো তখুনি।

সুবলদের বাড়িতে বিশাল তিনটা ঘর। বাড়ির পেছনে ফলফলারির গহিন বাগান। একটা বাঁধানো পুকুর। তার ওপর কাছেপিঠে কোনো বাড়ি নেই। এই রকম একটা বাড়িতে দীনু একলা! এইটুকু ভেবে দীনু ভয়ে গুটিয়ে যায়। সারা দিন কিছু খায়নি। তবুও খিদে টের পায় না। চোখ বন্ধ করে খোলা জানালার পাশে পড়ে থাকে।

শেষরাতে একটুখানি চাঁদ উঠেছিল বলে, জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল বলে রক্ষা। রাতটা দীনুর কেটে যায়। নয়তো কী যে হতো, দীনু হয়তো সেদিনই...

পরদিন বাজারে গিয়ে জমির চাচাকে ধরে দীনু। জমির বাজারের কোণে বসে ভিক্ষা করে। ভালো মানুষ। তবু লোকে বলে জমির পাগলা। দীনু ডাকে জমির চাচা।

সেই জমির চাচাকে পটিয়ে এল দীনু। তোমার তো কোথাও থাকার জায়গা নেই, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে সুবলদের বাংলাঘরে থাকবে। সুবলরা কেউ বাড়ি নেই। আমি এখন সুবলদের বাড়ির মালিক।

তারপর সুবলদের চলে যাওয়ার কথা, দেশে যুদ্ধ লেগেছে, মিলিটারিদের কথা আর সুবলের দিদিমার মুখে শোনা স্বাধীনতার কথা সবই জমির চাচাকে বলে দীনু। জমির চাচা চমৎকার লোক। দীনুর কথায় রাজি না হয়ে কি পারে!

সেই থেকে জমির চাচা আর দীনু দুজনে সুবলদের বাংলাঘরে থাকে। দিনের বেলাটা দীনুর কাটে এবাড়ি-ওবাড়ি করে। জমির চাচা থাকে বাজারে। সুবলের দিদিমা বলে গিয়েছিলেন, ঘরে চাল ডাল সব আছে। রান্না করে খাস দীনু। তোর ছমাস যাবে।

দীনু বড় ঘরটা খোলেনি। সে রান্না করতে জানে না। চাল-ডাল তেমনি আছে। আজ দুমাস। কিন্তু আজই আবার দীনুর মন খারাপ হয়ে গেল দুপুরবেলা।

দুপুরের দিকে দশ দিন পরে রোদ উঠেছে দেখে দীনুর খুব ফুর্তি। লাফাতে লাফাতে গেছে খোকনদের বাড়ি। খোকনকে নিয়ে আজ খালের জলে খুব সাঁতার কাটবে ভেবেছে। খোকনদের বাড়ি গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

খোকনদের বাড়িতে কেমন একটা সাজসাজ রব। খোকনের সব ভাইবোন জামাকাপড় পরে ছুটোছুটি করছে। খোকনের মা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছেন, একে বলছেন এককথা আর ওকে আরেক কথা। খোকনদের বাড়ির সঙ্গেই খাল, সেখানে একটা বড় ছইওয়ালা নৌকা বাঁধা। মাঝিরা খোকনদের সব বোঁচকাবুঁচকি নৌকায় তুলছে।

কী ব্যাপার, খোকনরা যায় কোথায়?

দীনু অবাক হয়ে খোকনের মাকে জিজ্ঞেস করে, খালা কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

খোকনের মা দুঃখী গলায় বললেন, বকুলতলী যাচ্ছি রে দীনু। আমার বড় ভাইর বাড়ি।

কেন?

ওমা তুই জানিস না, শহরে মিলিটারি এসে গেছে। সবাই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। মিলিটারিরা সব লোকজন মেরে ফেলবে।

দীনু ভয় পেয়ে বলল, তাই নাকি। কবে এসেছে?

কাল সন্ধ্যায়। হাইস্কুলে ক্যাম্প করেছে। বৃষ্টি-বাদলা ছিল বলে বেরোয়নি। আজ রোদ উঠেছে, দেখবি খানিকবাদেই বেরোবে। তারপর যাকে পাবে তাকেই মারবে। তুইও চলে যা কোথাও।

দীনু অবাক হয়ে বলল, আমি কোথায় যাব? এই শহরের বাইরে আমার কোনো চেনা মানুষ নেই। কার কাছে যাব?

খোকনের মা একটু রাগী। এই শহরে এই একজন মানুষ, দীনু যাকে খুব ভয় পায়। তবু এই মুহূর্তে সাহস করে বলল, খালা, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নেবে?

কোথায়?

বকুলতলী।

শুনে খোকনের মা একটু গম্ভীর হয়ে যান। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বাবা দীনু, আমার ভাই খুব গরিব মানুষ। বাড়িতে একটাই ঘর। তার বড় সংসার,

ঘরে জায়গা হয় না। তার ওপর আমরা এতগুলো লোক। কোথায় থাকব, কেমন করে থাকব জানি না। এই অবস্থায় তোকে কেমন করে নেব বাপ!

খোকনের মা আঁচলে চোখ মোছেন। দেখে দীনুরও চোখ ভরে আসে জলে।

খোকনের মা দীনুর মাথায় হাত রাখেন। মন খারাপ করিসনে বাপ। আমি দোয়া করি, তোর কিচ্ছু হবে না। এত সুন্দর ছেলে তুই, এত ভালো, আল্লাহও তোকে মারতে লজ্জা পাবেন।

তারপর নৌকায় গিয়ে ওঠেন।

খোকনরা সব আগেই নৌকায় উঠে বসেছিল, মা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝিরা বৈঠা ফেলল খালের জলে। দীনু মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল খালপাড়ে সাদা বেলেমাটির ওপর।

তখন সেই মফস্বল শহরে চমৎকার রোদ। চারদিকের শূন্য বাড়িঘর রোদের আলোয় ঝকমক করছে। খালের জলে, বর্ষার ধানিমাঠে রোদ আর হাওয়ার খেলা আছে। কোথাও কোনো ধানিমাঠের ভেতর নেমেছে কোড়াপাখি। তার কুরকুর একটানা ডাক শোনা যায়। খালপাড়ে দাঁড়িয়ে দীনু ভাবে, সবারই কোথাও না কোথাও জায়গা আছে, কেবল তার নেই।

বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে দীনুর। মন খারাপ করে খালপাড় ধরে একাকী হাঁটতে থাকে দীনু। কোথাও কোনো লোকজনের চিহ্ন নেই, সাড়া নেই। দিনের বেলাটাকে মনে হয় রাতদুপুর। সবাই ঘুমাচ্ছে।

দীনু এখন কোথায় যাবে?

জমির চাচার কথা মনে পড়ে দীনুর। জমির চাচা সকালবেলা বৃষ্টি মাথায় বেরিয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই বাজারের কোণে বসে ভিক্ষা করছে। দীনু ভাবে, জমির চাচাকে গিয়ে মিলিটারিদের কথা বলবে। তারপর জমির চাচার সঙ্গে কোথাও চলে যাবে। জমির চাচার নিশ্চয়ই কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে। আর জমির চাচা যদি যায়, দীনুকে ফেলে যেতে পারবে না।

তারপরই দীনুর মনে হয় শহরের কোথাও কোনো লোক নেই আজ। বাজার কি বসেছে! সবাই পালালে দোকানিরাও পালাবে। আর দোকানিরা পালালে জমির চাচাও পালাবে। কিন্তু দীনুকে ফেলে কি জমির চাচা পালাতে পারে? দুমাস ধরে একসঙ্গে আছে!

দীনুর মাথার ভেতর ছোটখাটো একটা গিঁট লেগে যায়।

খালের ওপারেই হাইস্কুল। জমির চাচার কথা ভাবতে ভাবতে স্কুলের কাছাকাছি এসে গেছে, তখন, ঠিক তখুনি মিলিটারিদের মধ্যে একজন তার নিশানা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। অটোমেটিক রাইফেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দীনু দেখে একের পর এক আগুনের মৌমাছি ছুটে আসছে তার দিকে। তার মাথার ওপর সারা শহরের কাক কা কা করছে।

দুহাতে বুক চেপে ধরে দীনু। দেখে দশ আঙুলের ফাঁক দিয়ে জোয়ারের জলের মতো নেমে যাচ্ছে রক্ত। খাল পাড়ের সাদা মাটি লাল হয়ে যাচ্ছে।

আস্তেধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনু। চোখ দুটো ভীষণ টানছিল তার। তখুনি দৃশ্যটা দেখতে পায় দীনু। তার বুকের রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লম্বা এক খাল। সেই খাল বেয়ে ফিরে আসছে হাজার হাজার ছইওয়ালা নৌকা। প্রথম নৌকায় সুবলরা। সুবলের দিদিমা বসে আছেন ছইয়ের ভেতর। তার পেছনের নৌকায় খোকন। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উল্লাসের শব্দ। দেখে দীনু যে কী খুশি! সবাই ফিরে আসছে। তাহলে এই কি স্বাধীনতা! সুবলের দিদিমা বলেছিলেন।

স্বাধীনতার কথা ভেবে দীনুর ঠোঁটে বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো সুন্দর এক টুকরো হাসি ফুটেছিল। কেউ তা দেখেনি।

১৯৮৪

রাজার চিঠি

প্রাতঃকালে ঘুম ভেঙে রাজা দেখেন জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে ডিমের কুসুমের মতো গাঢ় রোদ। মিহিন একটা হাওয়া এসে খেলা করছে রোদের সঙ্গে। জানালার পাশে বাগানে ফুটেছে অজস্র ফুল। হাওয়ায় ফুলের মৃদু সুবাস।

রাজার ঘুম ভাঙে একটু বেলাবেলি। আজ বহুকাল পর তাঁর ঘুম ভেঙেছে সকাল সকাল। ঘুম ভাঙার পরই রাজার আজ মনে পড়েছে প্রাতঃকালীন পৃথিবী খুব সুন্দর। এই রোদ, এই হাওয়া বহুকাল তিনি দেখেননি।

রাজা যখন এসব ভাবছেন ঠিক তখুনি তাঁর জানালায় উড়ে এসে বসে অচেনা সোনালি বর্ণের এক পাখি। ছোট্ট ভারি সুন্দর পাখি! মিষ্টি সুরে ডেকে যায়। সেই ডাকে রাজার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে। মনে পড়ে বহুকাল রাজ্য চালিয়ে তিনি ক্লান্ত। চারপাশের সুন্দর পৃথিবী কতকাল তাঁর দেখা হয়নি। কতকাল তিনি ভেতরে ভেতরে উতলা হয়েছিলেন। এরকম একটি পাখির সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথা ছিল। রাজ্য চালাতে চালাতে রাজা সব ভুলে গিয়েছিলেন।

রাজা তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে পাখি দেখেন। ছোট্ট সোনালি বর্ণের পাখি মিষ্টি সুরে ডাকে, ডেকে যায়। সেই ডাকে রাজা ভুলে যান এক্ষুনি তাঁর বিচারকক্ষে যাওয়ার কথা। প্রজারা উন্মুখ হয়ে আছে। দর্শনপ্রার্থীরা আছে প্রাসাদের বাইরে।

দূরদূরান্ত থেকে আসে লোক। সাহায্য চাইতে, রাজাকে দুচোখ ভরে দেখতে।

আজ সকালে রাজার ওসব মনে থাকে না। বিভোর হয়ে তিনি সোনালি বর্ণের সেই পাখির সঙ্গে কথা বলেন, ও পাখি তুই কেমন আছিস, ভালো তো?

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাখি হঠাৎ করে উড়াল দেয়। দেখে রাজা পাগলের মতো ছুটে যান জানালায়। কী হলো, পাখি উড়ে গেল কেন? তাহলে কি আমার রাজ্যে প্রজারা সুখে নেই? পাখি আমাকে সেই খবর দিতে এসেছিল?

কথাটা ভেবে রাজা ভেতরে ভেতরে উতলা হয়ে পড়েন। প্রজারা তো কেউ আমাকে কখনো তাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলেনি! দুঃখ-কষ্টের কথা বলেনি! আমি কি আমার কর্তব্যে অবহেলা করেছি? মন্ত্রিপরিষদ আমার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। প্রাসাদের বাইরে আমাকে কখনো নিয়ে যায়নি। তাহলে কি ওরা জানে আমার রাজ্যের কোথাও চলছে দুর্দিন, কোথাও খরা, অনাবৃষ্টি! শস্যচারা পুড়ে গেছে! অনাহারে দিন কাটাচ্ছে প্রজারা! আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি।

এসব ভাবতে ভাবতে রাজা দেখেন, ছোট্ট সেই পাখি নগর পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে দূরে নদীর দিকে। নদী পেরিয়ে কোন দূরে যাবে পাখি!

রাজা মনে মনে বললেন, আমিও যাব, আমিও যাব।

তারপর তিনি হেঁকে উঠেন, কে আছিস?

সেই হাঁক রাজপ্রাসাদে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়ায় কুর্নিশ করে দাঁড়ায় নফর।

রাজা বলেন, আমি একজন নগণ্য রাজকর্মচারীর বেশে রাজ্য দেখতে বেরোব। কেউ আমাকে দেখে যেন বুঝতে না পারে স্বয়ং রাজাই বেরিয়েছেন রাজ্য দেখতে। ব্যবস্থা করো।

জো হুকুম, বলে নফর প্রস্থান করে।

রাজা রাজ্য দেখতে বেরোবেন এ কথা মুহূর্তে ছড়িয়ে যায় রাজমহলে। খবর পেয়ে ছুটে আসে মন্ত্রিপরিষদ। আসেন রানি, ছোট রাজকুমার।

মহারাজ! মন্ত্রীরা উন্মুখ হয়ে রাজার মুখপানে তাকায়।

রাজা ততক্ষণে রাজকীয় পোশাক পাল্টে নিয়েছেন। পরিধান করেছেন একজন নগণ্য রাজকর্মচারীর পোশাক। মুখমণ্ডলে জড়িয়ে নিয়েছেন শ্বেতশুভ্র একখণ্ড বস্ত্র। রাজাকে আর রাজা বলে চেনা যায় না।

রাজা বললেন, আপনারাও চলুন। কিন্তু প্রত্যেকেই সাধারণ রাজকর্মচারীর বেশে। আপনাদের দেখে প্রজাকুল যেন বুঝতে না পারে, চিনতে না পারে।

মন্ত্রিপরিষদ একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

রানি বললেন, এ কী কথা মহারাজ?

রাজার কোনোদিকে খেয়াল নেই। জানালার পথে বাইরের পৃথিবী দেখছিলেন তিনি। গম্ভীর গলায় বললেন, প্রিয়তমা, আমি আর কতকাল অন্ধ হয়ে থাকব?

ছোটকুমার এসে রাজার হাত ধরেন, পিতা আমিও যাব।

রাজা মুখ ঘুরিয়ে পুত্রের দিকে তাকান, দক্ষিণহস্ত রাখেন পুত্রের মাথায়, সে বড় দুঃখের পথ পুত্র, সে বড় দূরের পথ! তোমাকে আমি কোথায় নিয়ে যাব?

বালক কুমার দু'হাতে অশ্রুমোচন করে।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে রাজা টের পান প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। গ্রামপ্রান্তর থেকে রোদের হলকা আসছে নগরের দিকে। হাওয়ায় বেড়ালের লোমের মতো উষ্ণতা। চারদিকে অচেনা এক রুক্ষতা খানিক হাঁটার পরই টের পেতে থাকেন রাজা। বুকের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপে। রাজধানীর ভেতরেই কোথায় যেন সংগোপনে ঘটছে এক ধরনের হাহাকার। মানুষ কাঁদছে।

রাজা কোনো বাহন নেননি। মন্ত্রিপরিষদ চলেছে তার সঙ্গে। প্রত্যেকেরই খুব সাধারণ বেশ। নগণ্য রাজকর্মচারী বৈ আর কিছুই মনে হয় না তাদের। মুখমণ্ডলে প্রত্যেকেরই ফিনফিনে শ্বেতশুভ্র বসন। রাজা ছাড়া অন্য সবাই কিঞ্চিৎ বিরক্ত। পায়ে হাঁটার অভ্যেস নেই কারো। চলাচলের জন্য রয়েছে বাহন। অশ্ব। কিছুই সঙ্গে নেননি রাজা। পায়ে হেঁটে রাজ্য দেখবেন।

নগরের মাঝামাঝি এসে রাজা দেখেন পথের দুপাশে সার বেঁধে বসে আছে ভিখারি। পুরুষ রমণী বালক বৃদ্ধ। পাংশুটে অনাহারী চেহারা। কতকাল পেটপুরে খাওয়া হয়নি তাদের! দেখে রাজার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। আমার রাজ্যে লোকে ভিক্ষে করছে, অনাহারে আছে আর আমি প্রাসাদে বসে রাজকীয় খাবার গ্রহণ করছি? এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মৃত্যু হয়নি কেন?

মন্ত্রিপরিষদের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, আমার রাজ্যে প্রজারা ভিক্ষে করছে, অনাহারে আছে, এ কথা আমাকে জানানো হয়নি কেন?

মন্ত্রিপরিষদ পরস্পর পরস্পরের মুখপানে তাকায়। প্রধান ব্যক্তিটি বলে, মহারাজ, এরা অন্য রাজ্যের লোক। সেখানে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। খাদ্যের আশায় এরা আমাদের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

ততক্ষণে রাজা ও মন্ত্রিপরিষদের চারপাশ ঘিরে ভিখিরির মিছিল। শীর্ণ হাত বাড়িয়েছে প্রত্যেকে। দেখে রাজার বুকের ভেতর তোলপাড়। সঙ্গে কিছুই আনেননি তিনি। না অর্থ না মুক্তোহার। রাজা কি এদের ফিরিয়ে দেবেন! রাজা ভেবে পান না।

মন্ত্রিপরিষদ দূর দূর করে তখন ভিখিরি তাড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, হোক এরা পাশের রাজ্যের। আমার অতিথি। আমার রাজ্যে কোনো ভিখিরি থাকবে না, অনাহারী থাকবে না। এদের খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন।

মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে বলল, জো হুকুম জাহাঁপনা।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রাজা যখন নদীতীরে এসে পৌঁছুলেন তখন মধ্যাহ্ন। রোদে পুড়ে উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তাঁর। মন্ত্রিপরিষদ বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রাজার এই অকস্মাৎ রাজ্য দেখতে বেরোনো তারা পছন্দ করছে না। রাজা কখনো এরকম খেয়ালি কাজ করেননি। এতকাল রাজ্য চালাচ্ছেন, কখনো মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে তিনি কোনো কাজ করেননি। মন্ত্রিপরিষদ যা বুঝিয়েছেন তাই সত্য বলে বুঝে নিয়েছেন। এই প্রথম রাজা নিজের ইচ্ছেয় একটা কাজ করছেন। রাজ্য দেখতে বেরিয়েছেন। তার আগে মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেননি। তাদেরকে জানাননি আমি রাজ্য দেখতে বেরোব। আমার প্রজারা কেমন আছে, আমি জানতে চাই।

এ কি তাহলে রাজার বিদ্রোহ!

মন্ত্রিপরিষদ এতকাল রাজাকে যে মিথ্যে প্রবোধ দিয়েছে, আপনার রাজ্যে কেউ দুঃখে নেই, অনাহারে নেই, আপনার রাজ্যে একজনও ভিখিরি নেই, রাজ্যে শস্য ফলছে প্রচুর, প্রজারা আপনার গুণগানে মুগ্ধ, এইসব মিথ্যের কি আজ অবসান হবে?

এইসব ভেবে মন্ত্রিপরিষদ আতঙ্কিত, ভীত। রাজা আজ স্বচক্ষে সব দেখবেন। জেনে যাবেন তাঁর রাজ্যে কেউ সুখে নেই, অনাহারে থাকে প্রজাকুল, পথেঘাটে ভিখিরির মিছিল, অনাচার হাহাকার রাজ্যময়। রাজার গুণগান গাওয়ার মতো একটি প্রজাও নেই রাজ্যে। আর এসবের জন্য দায়ী মন্ত্রিপরিষদ।

পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মন্ত্রিপরিষদ যখন এসব ভাবছে রাজা তখন উদাস হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে। কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ খালের মতো নদী। ওপারের গ্রামপ্রান্তর মধ্যাহ্নের রোদে রুক্ষ হয়ে আছে। এপারে কোনো ছায়া নেই, হাওয়া নেই চরাচরে। দুই-একটা পাখি ডানায় রোদ ভেঙে উড়ে যায় ওপারের দিকে।

রাজা বললেন, আমি ওপারে যাব।

মন্ত্রিপরিষদ আবার পরস্পর পরস্পরের মুখপানে তাকায়। প্রধান ব্যক্তিটি বলে, মহারাজ, আপনার কষ্ট হবে।

রাজা বলেন, আমি যাব।

খেয়াঘাটের দিকে হাঁটতে থাকেন রাজা। কেন যে তাঁর মনে হয় আমার রাজ্যে কেউ সুখে নেই। প্রজাকুল অনাহারে আছে, ভিখিরিতে ভরে গেছে রাজ্য, অত্যাচার-অনাচারে প্রজাকুলের জীবন বিপন্ন। রাজ্যের ভেতরে শুরু হয়েছে দুর্দিন, খরা। মন্ত্রিপরিষদ এতকাল আমাকে ভুল জীবনের ভেতর রেখেছে। ভুল স্বর্গে বন্দি করে রেখেছে। আমি অন্ধ ছিলাম, আমি অন্ধ ছিলাম!

ওপারে এসে রাজা দেখেন দুপাশে শস্যের মাঠ আর তার মধ্যিখান দিয়ে রমণীর সিঁথির মতো চিরল মেঠোপথ। মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে সেই পথে হাঁটতে শুরু করেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে রাজা উদাস বিষণ্ন চোখে দুপাশের শস্যমাঠের দিকে তাকাচ্ছিলেন। মাঠে শস্য নেই, রোদে পুড়ে খাক হয়ে গেছে সব। দু-একজন কৃষক তবু সেই মাঠে শস্য ফলাবার চেষ্টা করছে। তাদের আদুল গা রোদে পুড়ে কুচকুচে কালো। রাখাল বালক বসে আছে বৃক্ষের ছায়ায়। শস্যমাঠ এখন গোচারণ ভূমি।

দেখে রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মন্ত্রিপরিষদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এখানে ফসল ফলেনি কেন?

মন্ত্রিপরিষদ পুনরায় পরস্পর পরস্পরের মুখপানে তাকায়। রাজ্যের কৃষিবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, মহারাজ, এই অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা শুরু হয়েছে। বৃষ্টি নেই। শস্যচারা বৃষ্টি না পেয়ে রোদে পুড়ে খাক হয়েছে।

রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, নদী থেকে জল তোলার ব্যবস্থা হয়নি কেন?

মন্ত্রীটি কথা বলে না।

রাজা বললেন, এই অঞ্চলে নিশ্চয় তাহলে প্রজারা অনাহারে আছে?

মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে বলল, না মহারাজ সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি।

কী ব্যবস্থা?

রাজভাণ্ডার থেকে খাদ্য সরবরাহ করেছি। প্রয়োজনে আরো করব।

এই কথা আমাকে জানানো হয়নি কেন?

মন্ত্রিপরিষদ কথা বলে না।

শস্যের মাঠ শেষ হতেই একখানা গ্রাম। দূর থেকে সুন্দরী রমণীর ভ্রুরেখার মতন কালো দেখাচ্ছিল। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল গ্রামটি আসলে রুক্ষ। রোদে পুড়ে গাছপালা সব ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। হাওয়ায় সাদা ধুলো উড়ছে। গাছপালার আড়ালে গরিব প্রজাদের কুটির নজরে আসে। কোথাও কোনো জনমনিষ্যির সাড়া নেই। শিশু কাঁদে না, বালক ছুটোছুটি করে না, রমণীরা জল নিতে যায় না পুকুরে। একটা পাখিও ডাকে না কোথাও।

রাজার অনেকক্ষণ ধরে জলতেষ্টা পেয়েছে। গ্রামের ভেতর ঢুকে কোথাও কোনো জনমনিষ্যির সাড়া না পেয়ে জলতেষ্টার কথা ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি।

একখানা কুটিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রাজা বললেন, এই গাঁয়ে কি প্রজা নেই?

মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে বলল, নিশ্চয় আছে মহারাজ।

সাড়া নেই কেন?

আহার শেষে নিশ্চয় সুখনিদ্রায় মগ্ন তারা।

ঠিক এ সময় সামনের একখানা ক্ষুদ্র কুটির থেকে খুক খুক করে শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় কেশে উঠল কেউ। মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে রাজা এসে দাঁড়ালেন সেই কুটিরের সম্মুখে। কে আছ, পথিককে জল দাও।

ভেতরে কোনো সাড়া নেই।

রাজা আবার বললেন, কে আছ, ক্লান্ত পথিককে জল দাও।

খানিকপর একবৃদ্ধ হাতে জলের ঘট, ক্লান্ত বিষণ্ন ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল রাজার সম্মুখে। জলগ্রহণের আগে রাজা বৃদ্ধকে লক্ষ্য করেন। নিম্নাঙ্গে এক টুকরো বস্ত্র জড়ানো, আদুল গা। পাংশুটে মুখে দীর্ঘকালের অনাহার ছায়া ফেলেছে।

রাজা বললেন, কুটিরে আর কেউ নেই?

না।

কোথায় গেছে?

নগরে।

কথা বলতে বৃদ্ধের কষ্ট হয়। চোয়ালে মুখ হাঁ করে শ্বাস টানছে সে। পা টলমল করছে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

রাজা বললেন, নগরে গেছে কেন?

ভিক্ষা করতে।

বৃদ্ধ হাত-পা দুমড়ে মাটিতে বসে পড়ে। রাজা ততক্ষণে জলপান শেষ করেছেন। ঘটিটি মাটিতে রেখে তিনিও বসেন বৃদ্ধের পাশে। মন্ত্রিপরিষদ ঘিরে আছে চারপাশ। রাজা খেয়াল করেন না।

বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আপনারা কারা?

পথিক। বহুদূরের পথিক।

শুনে বৃদ্ধ কপাল চাপড়ায়। আহা, পথিককে শুধু জল দিলাম! ক্ষমা করবেন হুজুর। ঘরে এককণা অন্ন নেই। চার দিন অনাহারে আছি। সইতে না পেরে গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে গেছে নগরে। আমার চলাচলের ক্ষমতা নেই বলে পড়ে আছি।

কতকাল হলো দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে এখানে?

সে বহুকাল হুজুর। মানুষ মরে উজাড় হয়ে গেছে। যারা দু-চারজন আছে তারা নগরে ভিক্ষা করে বাঁচে।

তোমাদের গাঁয়ে রাজভাণ্ডারের খাদ্যদ্রব্য এসে পৌঁছয়নি?

না হুজুর। এ কী সেই রাজার রাজ্য, প্রজারা অনাহারে আছে দেখে রাজভাণ্ডার খুলে দেবেন!

এ কথায় রাজার বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বৃদ্ধের মাথায় দক্ষিণহস্ত রেখে রাজা বলেন, অপেক্ষায় থেকো, তোমার কাছে রাজার চিঠি আসবে।

অপরাহ্নে রাজা ফিরে আসেন নদীতীরে। বৃদ্ধের কুটির থেকে বেরিয়ে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে একটিও কথা বলেননি। এই দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি তাঁর রাজ্যের দুর্দিনের কথা ভেবেছেন। বারবার বুকের ভেতর মুচড়ে উঠেছে তাঁর। কান্না পেয়েছে। তিনি জেনে গেছেন মন্ত্রিপরিষদ তাঁর রাজ্য ছারখার করে দিয়েছে। রাজভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে নিজেরা লুটেপুটে। রাজাকে রেখেছিল মিথ্যে প্রবোধের ভেতর। ভুল জীবনে, ভুল স্বর্গে। এ জীবন রাজা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর রাজ্যে কোনো দুঃখী প্রজা থাকবে না, অনাহারী প্রজা থাকবে না।

এ আমি কী করেছি, এ আমি কী করেছি? রাজা ভাবলেন। আমি এতকাল অন্ধ ছিলাম কেন? আমি আমার দায়িত্বে অবহেলা করেছি। প্রাসাদে বসে রাজকীয় জীবন কাটিয়েছি। কেন প্রজাদের দ্বারে দ্বারে যাইনি, কেন জানতে চাইনি তাদের দুঃখের কথা, অভাব অভিযোগের কথা!

নদীতীরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা ভাবলেন, আমাকে আবার শুরু করতে হবে। প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।

নদীতে পারাপারের কোনো নৌকো ছিল না। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। এই প্রথম দীর্ঘক্ষণ পর রাজা মন্ত্রিপরিষদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নগরে যাব কেমন করে?

মন্ত্রিপরিষদ কথা বলে না। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে খুবই কাতর তারা। ভেতরে ভেতরে রাজার ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছে। তাদের সব মিথ্যে প্রবোধ রাজা আজ ধরে ফেলেছেন।

এ সময় মাঝনদীতে ছোট একখানা জেলেনৌকো দেখা গেল। নদীতে জাল ফেলে বসে আছে শীর্ণ অনাহারী পাংশু চেহারার এক জেলে।

মন্ত্রিপরিষদ চিৎকার করে জেলেকে ডাকে।

খানিক পর জাল তুলে তীরে এসে নৌকো ভেড়ায় জেলে। রাজা বললেন, ভাই, আমরা নগণ্য রাজকর্মচারী। নগরে যাব।

জেলে বিনীত গলায় বলল, আসুন হুজুরগণ।

মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে রাজা নৌকোয় চড়লেন।

রাজা বসেছিলেন জেলের পায়ের কাছে। অন্ধকারে জেলেটির মুখ ভালো করে দেখা যায় না। ধীরমন্থর গতিতে নৌকো বাইছে সে। রাজা বুঝতে পারেন, জেলেটি মধ্যবয়সি এবং ক্ষুধায় ক্লান্তিতে কাতর।

রাজা বললেন, নদীতে মাছ কেমন?

জেলে খুক খুক করে কাশে। শ্বাস টেনে টেনে বলে, দুদিন ধরে জাল বাইছি। একটাও মাছ পাইনি হুজুর। একা মানুষ। জাল টানা বড় কষ্টের।

সংসারে কে কে আছে তোমার?

কেউ নেই হুজুর। একটা ছেলে ছিল। রাজার জন্য যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

একথায় রাজা ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠেন। তবু শীতল কণ্ঠে বলেন, রাজার লোক তোমার খোঁজখবর করেনি?

না হুজুর।

রাজভাণ্ডার থেকে মৃত যোদ্ধাদের আত্মীয়-পরিজনের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা তুমি পাওনি?

না হুজুর। আমি কেন, কেউ পায়নি। আমাদের রাজা কি আর প্রজাদের কথা ভাবেন? তাহলে রাজ্যের অর্ধেক লোক কি আর অনাহারে মরত!

রাজা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

নৌকো তখন এপারে এসে ভিড়েছে। নেমে যাওয়ার আগে জেলেটির হাত ধরে রাজা বললেন, অপেক্ষায় থেকো, তোমার কাছে রাজার চিঠি আসবে।

তারপর পুনরায় রাজা মনে মনে বললেন, আমাকে আবার শুরু করতে হবে। প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।

সেদিনই রাত্রির মধ্যযামে ক্রুদ্ধ মন্ত্রিপরিষদের হাতে রাজা নিহত হন। এক বৃদ্ধকে, এক জেলেকে রাজা কথা দিয়েছিলেন, অপেক্ষায় থেকো, তোমাদের কাছে রাজার চিঠি আসবে।

তারা আর কতকাল অপেক্ষায় থাকবে!

১৯৭৮

প্রস্তুতিপর্ব

নদীর দিকে তাকিয়ে বাচ্চু খুব উদাস গলায় বলল, ইলশা মাছের জন্মবেত্তান্ত লইয়া কিছু কন নিতাই দাদা।

বুড়ো নিতাইচরণ ঠাকুরদার আমলের আলোয়ানখান অকারণে কাঁধের ওপর একটু জড়িয়ে বলল, বিড়ি ধরাও। বিড়ি না খাইলে কথা আহেনি।

বিড়ি আছে তিনখান। হিসাব কইরা না খাইলে টাইম যাইব কেমনে!

নিতাইচরণ ফোকলা মুখে একটু হাসে। পোকায় খাওয়া ভাঙাচোরা দাঁত তার। জন্মের পর ভুলেও কখনো দাঁত মাজেনি। হলুদ ছোপ ধরা দাঁতে কথা বলতে শুরু করলেই মুখ থেকে মানুষের বাহ্যির গন্ধ ভুরভুর করে বেরোয়। এই জন্য বাচ্চুরা নিতাইচরণের গা বাঁচিয়ে বসে। মুখের সামনে ঘেঁষে না।

মুখখান নিতাইচরণের, শালা আস্ত একখান পায়খানা। বাতাস দিলে গুয়ের গন্ধ ছোটে।

খোকা বলল, ইবার পদ্মায় ম্যালা ইলিশ পড়ছে। দেহচ না কত নাও।

চারজন একসঙ্গে নদীর দিকে তাকায়। মাঝনদীতে পালতোলা জেলে নাও শয়ে শয়ে। হাওয়ার টানে ভাটির দিকে ছুটছে। দেখে বাচ্চু আবার বলল, নিতাইদাদা ইলশা মাছের জন্ম বেত্তান্তডা...

পুরনোকালের চোখ দুটো নদীর দিক থেকে ফিরিয়ে নিতাইচরণ ফোকলা মুখে আবার একটু হাসে। আলোয়ানখান কাঁধের ওপর আবার একটু জড়ায়। বিড়ি না হইলে, বুঝলা না!

দুলাল বলল, বাচ্চু, বিড়ি বাইর কর।

দুলালের দিকে তাকিয়ে বাচ্চু একটুখানি চোখ টেপে। দেখে দুলাল বোঝে, বাচ্চু এখন বিড়ি বের করবে না। নিতাইদাদাকে অন্যকথায় ভুলাতে হবে।

দুলাল বলল, নিতাই দাদা, আপনে সব সময় আলোয়ানখান পইরা থাকেন কেন?

শুনে নিতাইচরণ আবার হাসে। বড় মায়ায় আলোয়ানখান কাঁধে জড়ায়। আলোয়ানখানের বয়েস জানো?

তিনজন একসঙ্গে বলল, না।

সঙ্গে সঙ্গে নিতাইচরণের সাদাকালো দাড়ি গোঁফওয়ালা বীভৎস মুখটা গর্বে উজ্জ্বল হয়ে যায়। পাটের আঁশের মতো লম্বা চুল নদীর মগ্ন হাওয়ায় উড়ছে, চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া। নিতাইচরণকে এখন বহুদূরের মানুষ মনে হয়। অচেনা। বাচ্চুরা এটাই চাইছিল। এখন নিতাইচরণ সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন হয়ে যাবে। বিড়ির কথা ভুলে যাবে। শুরু করবে আলোয়ানের গল্প। বহুবার শোনা গল্পটাই বাচ্চুরা এখন মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকবে। যেন জীবনে এই প্রথম শুনছে।

নিতাইচরণ বলল, আলোয়ানখানের বয়েস হইল সাড়ে পাঁচ কুড়ি। আমার ঠাকুরদাদারে দিছিল, ভাইগ্যকুলের কুণ্ডেগ নাম হুনছো?

তিনজন একসঙ্গে বলল, হ।

নিতাইচরণ খুশি হয়ে বলল, বিক্রমপুরের বেবাক মাইনষে হেগো নাম জানে। না জাইন্নানি পারে, কও? হেরা আছিল বিক্রমপুরের সেরা ধনী। বাইশখান আছিল ইস্টিমার। ঢাকা থনে গোয়ালন্দ যাইত, গোয়ালন্দ থনে যাইত কইলকাত্তা। এই গাঙ দিয়াঐ যাইত। বিয়ান রাইতে যাইত মিসটেইম আর দুইফরে মেইল।

খোকা বলল, মিসটেইম কী?

শুনে দুলাল ধমকে উঠে, ওই বেডা, এত প্যাচাইল পারচ ক্যা?

নিতাইচরণ ফোকলা মুখে হাসে। বিয়ান রাইতে যেই ইস্টিমারখান যাইত হেইডারে কইত মিসটেইম আর দুইফরে যাইত যেইডা হেইডা হইল গিয়া মেইল।

খোকা বলল, বুজছি বুজছি। কন, তারবাদে।

আহা হেইদিন আর নাই। দিগলী তহন বিরাট বন্দর। বিয়ান রাইতে মিসটেইম ফিরত। জাউল্লারা নাও বোঝাই ইলশামাচ উডাইত ইস্টিমারে। হেই মাচ যাইত গোয়ালন্দ, কইলকাত্তা। আর এই মাওয়ার ঘাট দিয়া যাওনের সময় মিসটেইমখান কী সোন্দর একখান আওয়াজ দিত। ভোঁ ও ও ও...

মুখখান চোক্কা করে হুবহু ইস্টিমারের সিটি বাজিয়ে দেয় নিতাইচরণ। শুনে বাচ্চুরা তিনজন হেসে ফেলে।

নিতাইচরণ ওসব খেয়াল করে না। অবাক হয়ে বলে, ছোডকালে তোমরা মেইল মিসটেইম দেহ নাই? আওয়াজ হোনো নাই? ঠিক এইরকম আওয়াজঐ করত।

বাচ্চু বলল, ছোডকালে তো পদ্মায় আমরা কুনও ইস্টিমার দেহি নাই। খালি লঞ্চ দেকছি।

অহনও যেমন লঞ্চ আগে ঠিক অমুনঐ আছিল। খালি এই জেটিখান আছিল না। গাঙের পার আছিল মাঝগাঙে। লঞ্চ আইসা চটান মাটিতে সিঁড়ি নামাইত।

দুলাল বলল, গাঙের ভাঙনে কইলাম আমগো একখান উপকার হইছে।

খোকা বলল, কী?

এইডা বুজচ না! গাঙে না ভাঙলে গবম্যান্ট এই মাওয়ার ঘাটে জেটি দিতনি! জেটি না থাকলে আমরা বইতাম কই?

নিতাইচরণ মুগ্ধ গলায় বলল, এইডা হাচা কথা।

বাচ্চু বলল, এই হগল বাদ দেন। আলোয়ানের গল্পখান কন নিতাই দাদা।

হ হ। আমার ঠাকুরদাদায় আছিল কুণ্ডেগ বাড়ির বান্ধা নাপিত। রোজ বিয়ানে যাইয়া বড় কত্তারে পেন্নাম করত। তারবাদে মুখ বানাইত, চারি কাইট্টা দিত। কত্তায় সাত দিনে একদিন চুল ছাঁটাইত। কইলকাত্তা চইলা যাওনের সময় কত্তায় খুশি হইয়া ঠাকুরদাদারে এই আলোয়ানখান দিয়া গেল। এইডা কইলাম ইন্দুস্থান পাকিস্তান অওনের বহুত আগের ঘটনা। পাকিস্তান হইল আমার আমলে। আমার পিতামাতা বেবাক তহন সগ্‌গে।

নিতাইচরণ বিনীত দুহাত নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকাল। ব্যাপারটা বাচ্চুরা জানে। মা-বাপের উদ্দেশে কথা বললেই নেতাইচরণ এই ভাবটা করে। শ্রদ্ধা।

খোকা বলল, আপনের আমলে তাইলে দুইবার দেশ স্বাধীন হইতে দেখলেন?

হ হ পাকিস্তান হইতে দেখলাম তারবাদে দেখলাম বাংলাদেশ হইতে। তয় হোনো, আলোয়ানখান ঠাকুরদাদায় মইরা যাওনের সময় দিয়া গেল আমার বাপরে।

খোকা বাঁধা দিয়ে বলল, আপনের আর কুনো কাকা-জ্যাঠা আছিল না?

শুনে দুলাল ধমকে ওঠে। তুই বহুত আজাইরা প্যাঁচাইল পারচ খোকা। দাদারে গল্পডা কইতে দে।

নিতাইচরণ বলল, তুমরা তো কিচ্ছু জানো না। আমগো বংশে কলাম একটা কইরাঐ পোলা হয়। আমি আমার বাপের এক পোলা, বাপ আছিল ঠাকুরদাদার একপোলা, ঠাকুরদাদায় আছিল তার বাপের এক পোলা, এইভাবে চৌদ্দপুরুষ।

খোকা বলল, আপনে বিয়া করলেও আপনের এক পোলা হইত?

হ। এর লেইগাইতো বিয়া করলাম না। এক পোলা থাকনের বিরাট দুঃখু জগতে। মা-বাপ মইরা গেলে আপনজন থাকে না। ভাই-বেরাদর হইল গিয়া মাইনষের জোরবল। জোরবল না থাকলে জগতে বাইচ্চা লাভ নাই। আমারে দেহ না, জগতে আপন কেঐ নাই। এই দুঃখু তুমরা বুজবা না। আমার পোলা হইলে আমি মইরা যাওনের পর হেয়ও একলা হইয়া যাইত। একলা থাকনের দুঃখু বুঝি দেইখাইঐ তো বিয়া করি নাই।

দুলাল বলল, তয় আলোয়ানখান আপনের বাপে দিয়া গেল আপনেরে?

হ। আমারে ছাড়া আর কারে দিব!

খোকা বলল, আপনের অহন বয়েস কত নিতাই দাদা?

কথাটা শুনে বাচ্চু খরচোখে খোকার দিকে তাকায়। নিতাইচরণের জীবনকাহিনি ওদের জানা। তবু পুরনো কথা খোকা যে কেন তোলে!

নিতাইচরণ বলল, আমার বয়েস হইল গিয়া আড়াই কুড়ি।

এই বয়েসে আপনে বুড়া হইয়া গেলেন?

সব ভগমানের কিরপা। বুড়া অওনঐ ভালো। জুয়ানমদ্দ থাকনের ম্যালা জ্বালা।

দুলাল বলল, এই একখান কথার লাহান কথা কইছেন। আমগো দেকলেন না! জুয়ানমদ্দ মানুষ দেইখাঐত এই হগল করতাছি। দেশ স্বাধীন

করনের লেইগা পাকিস্তানি মেলেটারি খেদানোর লেইগা যুদ্ধ করলাম। দেশ স্বাধীন করলাম। যুদ্ধ খতম। আমরা বেবাকতে গেলাম আজাইর হইয়া। কামকাইজ নাই, টেকাপয়সা নাই। যুদ্ধের সময় মাইনষে কী খাতির করত! যেহেনে যাইতাম থাকন-খাওন ফিরি, টেকাপয়সা নেও কত লাগব। এই মাওয়ার বাজারে আইলে দোকানদাররা বিড়ি সিগ্রেটের প্যাকেট দিত, চা-মিষ্টি খাওয়াইত। বেবাক মাগনা। মুক্তিবাহিনী কথা কইলে কোন হালায় রাও করে! আর অহন দেহেন? যুদ্ধ খতম, দেশ স্বাধীন হইল, আমগো বাল দিয়াও পোছে না কেঐ। মা-বাপে বকা দেয়, মাইনষে চোখ ত্যারা কইরা চায়। কুনোহানে আমগো জাগা নাই। এর লেইগাঐ তো এই জেটিতে আইসা বইসা থাকি। খালি আপনে ছাড়া কেঐর লগে আমগো খাতির নাই।

কথা শেষ করে দুলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

খোকা-বাচ্চু দুজনেরই চেহারা এখন অন্যরকম। গম্ভীর। কেবল নিতাইচরণ ওদের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারটা বোঝে না বলে গায়ের আলোয়ানখানার গর্বে, বাপদাদার গর্বে হাসিখুশি মুখে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। বিড়ি খাওয়ার কথা মনে নাই তার।

ঠিক এই সময় বাচ্চু গম্ভীর মুখে লুঙ্গির কোঁচড় থেকে বিড়ি বের করে একটা। ম্যাচ বের করে ধরায়। দেখে নিতাইচরণসহ বাকি দুজন বহুকালের অনাহারীর মতো হাঁ করে বাচ্চুর বিড়িটার দিকে তাকায়। বাচ্চু ওসব খেয়াল করে না। বিড়ির ধোঁয়া নদীর হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

খোকা বলল, দুইটান কইরা দেইচ বাচ্চু।

বাচ্চু বলল, দুইটান কইরা হইব না। এক টান কইরা হইব বেবাকতেরঐ। দিতাছি।

বিড়ি দিল দুলালের হাতে। দুলালও কোনোদিক না তাকিয়ে পর পর দুটো টান দিল বিড়িতে। দিল খোকার হাতে।

নিতাইচরণ তখন হাঁ করে বিড়িটা দেখছে। কেউ দুটানের বেশি দিলেই হা হা করে উঠবে। বিড়ির বেজায় লোভ নিতাইচরণের।

দুলাল বলল, বুজলেন নিতাই দাদা, জুয়ানমদ্দ মাইনষের আর একখান দোষ হইল মাইয়া মাইনষের। আমগো রতনারে দেখলেন না! মুক্তিবাহিনীর কমন্ডার আছিল। চেরম্যান সাবের মাইয়া আলতার লগে পিরিত। হেই

মায়ায় চেরম্যান সাবরে মারল না রতনা। আমগোও মারতে দিল না। নাইলে আপনেঐ কন, মুক্তিবাহিনীর আমলে চেরম্যান সাব কী কামডা করল? রাজাকার হইল। মেলেটারিগ লগে ভাও দিয়া কত কিছু করল! গেরামের নিরীহ মানুষটিরে কম জ্বালাইছে! বাচ্চুর বাপরে ধমকাধমকি করছে, তুমার পোলায় কই গেছে কও আমারে, নাইলে আমি মেলেটারিগ খবর দিমু। আমার বড় ভাইরে, খোকার বাপরে বেবাকতেরে হালায় অপমান করছে। রতনার বাপরে তো হাজার মাইনষের সামনে এই মাওয়ার বাজারে খাড়াইয়া শুয়ারের বাচ্চা বাইনচোত কইয়া বকলো! বুড়া মানুষ দেইখা হাত উডায় নাই। হেই চেরম্যান সাবরে রতনা কিছু কইল না। দেশ স্বাধীন হওনের আগে আগে আমরা যহন গেরামে আইলাম, রতনা হইল গিয়া আমগ কমন্ডার, আমগ ইচ্ছাই আছিল গেরামে আইয়া পয়লাঐ চেরম্যান সাবের লাশখান পদ্মায় ভাসামু। চিডি আর কাফোনের কাপড় পাডাইলাম। চেরম্যান সাবের মাইয়া আলতা বুইজ্জা গেল এইডা কাগো কাম। গোপনে কারে দিয়া যেন রতনারে খবর পাডাইল। রাইত দুইফরে রতনা গেল আলতার লগে দেহা করতে। আমগো কিছু কইল না। পরদিন বিয়ানে কয়, আমার কথা ছাড়া চেরম্যান সাবের বাড়ির সামনে যাবি না কেঐ। আমরা তহন বুজলাম রতনার পায়ে হাতে ধইরা কান্দাকাডি করছে আলতা। মাইনষে কয় না মাইয়ামাইনষে ষোল্লোকলা জানে। আলতার লগে হইল রতনার পিরিত। মন গলতে কতক্ষুন লাগে!

বাচ্চু বলল, আমি তহনঐ কইছিলাম কামডা ভালো করলি না রতনা। মাইয়া মাইনষের লাইগা দেশের শত্রুরে বাঁচাইয়া দিলি? বুজবি একদিন! ভাও মতন পাইলে এই চেরম্যান সাবেঐ তরে খাইব। অহনে বুজবি না।

দুলাল বলল, কয়দিন বাদে দেশ গেল স্বাধীন হইয়া। তহন আমরা রাজাকার শান্তিবাহিনীর মানুষ খুঁইজা বেড়াই। রতনাও আমগো লগে। এই গেরামে ওই গেরামে যাই, চেরম্যান সাবের বাইত যাই না। চোক্কের সামনে এত বড় শত্রু তারে কিছু কইতে পারি না। রতনা না কইলে আমরা কেমনে কই! নাইলে আপনেঐ কন নিতাই দাদা, চেরম্যান কম জ্বালাইছে মাইনষেরে!

নিতাইচরণ তখন বিড়ির পাছা বড় মায়ায় টানছে। দুলালের কথায় থতোমতো খেয়ে বিড়িটুকু ছুড়ে ফেলল নদীর জলে। খসখসা গলায় বার দুয়েক

খাঁকারি দিল। কও কী, জ্বালায় নাই আবার! আমার কথাডা চিন্তা কর। জগতে কেঐ নাই, বাড়িঘর নাই। কুত্তার লাহান মাওয়ার বাজারে পইড়া থাকি। মাইনষে জুডাআইষ্টা দেয় খাই, একটা দুইডা পয়সা দেয়, বিড়িডা দেয় খাই। নাপতালি ছাইড়া দিছি কুনকালে। নাপতালি কির লেইগা ছাড়লাম হেডা তো আবার তুমরা জানো না! একদিন বিয়ানরাইতে দেহি মুচিপাড়ার কিষ্ণ মুরতিডা আমার মাথার সামনে আইয়া খাড়াইছে। আমি হের মিহি চাইতেঐ কয়, নিতাই, মাইনষের চুলদাড়ি আমি দিছি। হেই জিনিস তুই কাডচ ক্যা?

ঘুম থিকা উইঠা আমি এই আলোয়ানখান গায়ে দিয়া বাইর হইলাম। কিষ্ণ ভগবানে কইছে, খুর কেচি ধরন ছাইড়া দিলাম। বাইত আর গেলাম না। বাজারে থাকি বাজারে ঘুমাই। কেঐ কিছু দিলে খাই, নাইলে খাই না। এই রকম মানুষ হইলাম গিয়া আমি। মেলেটারিগ আমলে আমারে একদিন ধরল চেরম্যান সাবে। আমি বইয়া রইছি কাসেমের দোকানের সামনে। বিয়ানবেলা। চেরম্যান সাব আইল বাজারে। ম্যালা মানুষজন লগে। চেরম্যান সাবেরে দেইখা আমি উইঠা খাড়াইছি। পেন্নাম কত্তা। চেরম্যান সাব কয় কী জানোনি! ওই নাপ্তার পো, নাপ্তালি করচ না ক্যা? হুইন্যা আমার বুকটা কাঁইপা উঠল। ঢোক গিল্লা কইলাম, কিষ্ণ স্বপ্নে একদিন কইল, বুজলেন না কত্তা... হুইন্না চেরম্যান এক ধমক লাগাইল, বানরামি পাইছ হালারপো। বুজরকি চোদাও আমার লগে। কাইল থনে যুদি দেহি তুই খুর কেচি না ধরোচ তাইলে বুজবি মজা। মেলেটারিগ খবর দিমু। হিন্দু পাইলে মেলেটারি সাবেরা কথা কইব না, পুটকি দিয়া গুলি হান্দাইবো। হুইন্যা আমার জানডা জল হইয়া গেল। হেইদিনঐ গেরাম ছাইড়া পলাইলাম। গেলাম গা সোনারং। হেই মুন্সিগঞ্জের সামনে। আহা কী কষ্টডা করলাম তারবাদে। অচিন দেশ, মাইনষে চিনে না। তিন-চাইর দিন বাদে একদিন খাওন জুটত। ভিক্কা কইরা। তারবাদে হুনলাম দেশ স্বাধীন হইছে। বেবাক মেলেটারি পলাইছে। আবার গেরামে আইলাম। তারপর থনে তো তোমগো লগেই। কিন্তু চেরম্যান সাবেরে তো দেহি আগের লাহানঐ আছে। অহনে দেখলেও কত্তা কইয়া পেন্নাম দিতে হয়।

দুলাল বলল, বেবাকঐ রতনা হালার লেইগা। পিরিত চোদাইলা, অহন বোজ শালা। জেলের ভাত খাইতাছ। চেরম্যান যতদিন বাঁইচা আছে জেল থনে আর বাইর হওন লাগব না।

বাচ্চু বলল, একটা জিনিস দেখলি দুলাল। স্বাধীন হইল এক বছর কাটল না, চেরম্যান কইলাম আগের লাহান ক্ষমতা পাইয়া গেছে। আওয়ামী লীগের নেতাগ লগে খাতির। আমাগ বালও মনে করে না অহন। পর পর কী খাতির করত আমাগ! বাজান ছাড়া কথা কইত না!

খোকা বলল, বেবাক হইল অস্ত্রের গুণ, বুঝলি না! অস্ত্র জমা দেওনের পর থনেঐ চেরম্যান সাব আমাগ আর চিনে না।

হ নাইলে কি আর রতনারে জেলে দিতে পারে! লাশ হালাইয়া দিতাম না শালার!

নিতাইচরণ বলল, একটা কথা আমি বুঝলাম না। রতনারে চেরম্যান সাবে জেলে দিল ক্যা?

দুলাল বলল, এইডা তো পানির লাহান সোজা। রতনা সামন থাকলে আলতারে বিয়া দিতে পারব না! দেখলেন না, রতনা জেলে যাওনের পরঐ আলতার বিয়া হইয়া গেল।

হ, বুজছি। তয় রতনা এত চালাক ছেইলা, হেরে পুলিশে ধরে কেমনে?

রাইত কইরা রতনা গেছিল আলতার লগে দেখা করতে। চেরম্যান সাব কেমনে জানি খবর পাইছে রাইত-বিরাইত রতনা যায় আলতার লগে দেখা করতে। হেয় করছে কি, থানাথ থনে একজন দারোগা আর দুইজন পুলিশ আইন্না বাংলাঘরে বহাইয়া রাখছে। রতনা যাওনের লগে লগে চোর কইয়া ধরছে। হেই রাইতেঐ চালান দিছে থানায়। থানাথ থনে মুন্সিগঞ্জের জেলে।

তুমরা রতনার লগে দেখা করো নাই?

হ, খবর পাইয়া পরদিন বিয়ানেঐ আমরা তিনজন গেছি থানায়। গিয়া দেহি রতনার বাপ-চাচারাও গেছে। রতনা বাপ-চাচার লগে একটাও কথা কইল না। আমাগ তিনজনরে কইল, দেশ স্বাধীন করলাম ঠিকঐ, মায়া কইরা শত্রুডিরে ছাইড়া দিলাম। মহা ভুল করলাম রে। তয় তরা একখান কাম করিচ। অহনে কেঐরে কিছু কইচ না। কইয়া পারবিও না। শত্রুরা অহন শক্তিশালী হইতাছে। আরো হইব। আবার আমাগ একখান যুদ্ধ করতে হইব। কবে ছাড়া পামু জানি না। তয় তরা আমার লেইগা দেরি করিচ। এইবারের যুদ্ধটা আরো বড় হইব। একটা শত্রুরেও আমরা আর ছাড়ুম না।

নিতাইচরণ দেখে, তিনটি যুবকের মুখ এখন ক্রোধে জ্বলছে! চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, চোখ খাঁ খাঁ করছে। নদীর হাওয়ায় লম্বা চুল উড়ছে সবার। কেউ খেয়াল করে না। কেবল বাচ্চু ছেলেটা আনমনে লুঙ্গির কোঁচড় থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। দেখে নিতাইচরণ সব ভুলে বিড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। বাহ্যির গন্ধ ভরা মুখটা হাঁ করে শ্বাস ফেলে। তাতে নদীর মোলায়েম হাওয়া একটু ভারী হয়ে যায়।

খোকা বলল, রতনার বাপ-চাচারা কী করে? রতনার জামিনের তদবির করে না?

দুলাল বলল, করতাছে। হপ্তায় হপ্তায় মুন্সিগঞ্জ যায়। কাম হয় না। চেরম্যান সাবে পুলিশ দারোগাগো ম্যালা পয়সা খাওয়াইছে। এর লেইগ্যাঐ তো রতনার বাপে গেছিল চেরম্যান সাবের কাছে।

নিতাইচরণ এসবের কিছুই শুনছে না। তার চোখ বাচ্চুর বিড়ির দিকে। নিতাইচরণের টানা বিড়ি মুখে দেবে না ওরা। নিতাইচরণ টানলে বিড়ির পাছায় বদগন্ধ হয়। এই কথাটা একদম মনে থাকে না বাচ্চুর।

খোকা বলল, চেরম্যান সাবে কী কইল?

সাফ কথা কইয়া দিছে, আমি কিছু করতে পারুম না। আমার কাছে আইয়া কাম হইব না।

শুনে বাচ্চু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঠিক সেই সময় দূরে একটা লঞ্চের মৃদু ভটভট শব্দ শোনা যায়।

খোকা বলল, আমি ইট্টু মুইত্তা আহি। লঞ্চ আইয়া পড়লে মানুষজন থাকব। মুততে দেরি হইয়া যাইব।

খোকা উঠে গেল জেটির পেছন দিকে। পদ্মার ঘোলা পানিতে নিজের পানি ছাড়তে শুরু করে। সেই শব্দে বাচ্চুর কেন যে স্কুলে পড়া একটা ভাব সম্প্রসারণের লাইন মনে আসে। 'লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির'।

কথাটা ভেবে বাচ্চু একটু হাসে। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা দেশটাকে যা দিল, স্বাধীনতা, তা কি তাহলে একবিন্দু শিশিরের মতো মূল্যহীন! আসুক রতন, ফাইনাল যুদ্ধটা করে আমরা এবার দেশকে বলব, নাও স্বাধীনতা। এ শিশিরবিন্দুর মতো মূল্যহীন নয়। এ এক অমূল্য সম্পদ। রাখো যত্ন করে!

লঞ্চটা জেটিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে খোকা ফিরে এল। ততক্ষণে ছোটখাটো একটা ভিড় লেগে গেছে নির্জন জেটিতে, নদীতীরের চায়ের দোকানে। কয়েকজন যাত্রী নেমে এল জেটিতে। মাথায় বগলে বোঁচকা-বুঁচকি। কেউ যাবে ফরিদপুরে, কেউ যাবে ভাগ্যকূল বাজার। জেটির গায়ে লেগে থেকে লঞ্চটা এখন রাগী খোদাই ষাঁড়ের মতন গোঁ গোঁ করছে। তীব্র একটা ঢেউ উঠেছে পানিতে। তাতে ছোট্ট লোহার জেটি পুঁটি মাছের মতো লাফালাফি করছে। চারজন মানুষ সেই জেটিতে বসে দোলনায় চড়ার মতো দোল খায়।

বাচ্চু তাকিয়ে ছিল লঞ্চের দিকে। লঞ্চের ছাদে ম্যালা লোকজন, মালপত্র। সেসবের ভেতর থেকে মাত্র কয়েকজন যাত্রী নামল।

দিনে তিনবার লঞ্চ ভিড়ে মাওয়ার ঘাটে। সকালবেলা, দুপুরের পর আর শেষটা সন্ধ্যার আগে আগে। তিনটা লঞ্চই জেটিতে বসে বসে দেখে বাচ্চুরা। সকালবেলা আসে দশটা-এগারোটার দিকে। সেটা চলে গেলে দুপুরেরটার অপেক্ষা। সেটা চলে গেলে সন্ধ্যারটার।

রতন এই লঞ্চে করে ফিরে আসবে একদিন। বাচ্চুরা কি রতনের অপেক্ষায় বসে থাকে! রতন ফিরে এলে একটা কাজ পাওয়া যাবে। জেটিতে অপেক্ষা করতে হবে না। জীবনটা অন্যরকম হয়ে যাবে তাদের।

দুলাল বলল, ওই দেখ রতনার বাপে।

শুনে নিতাইচরণসহ তিনজন চমকে ওঠে। বাচ্চু দেখে, লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা রতনার বুড়ো বাপ নদীর হাওয়া বাঁচিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। কাঁধে পুরনো কালের চাদর, বগলে তালি মারা ছাতা। মুন্সিগঞ্জ থেকে রতনার কেসের তদবির করে ফিরল। মুখটা এত শুকনা লোকটার, দেখে বাচ্চুরা বুঝে যায়, রতনার কোনো গতি হয়নি।

দুলাল বলল, ল, রতনার বাপের লগে কথা কইয়াহি।

তিনজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। ওদের দেখাদেখি নিতাইচরণও। কাঁধে আলোয়ানখানা জড়িয়ে সেও যায়।

লঞ্চটা তখন যাত্রী তুলে নিয়ে উজান ঠেলতে আরম্ভ করেছে। উথালপাথাল ঢেউয়ে জেটিটা এখনো নাচছে।

ওরা চারজন আস্তেধীরে রতনার বাপের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ায়। নিতাইচরণ একটু দূরে। ওরা কিছু বলবার আগেই রতনার বাপ দুঃখী গলায়

বলল, কিছু হইল না বাজানরা। উকিল লাগাইছি। ম্যালা টাকাপয়সা খরচা করতাছি। কিছু হইতাছে না। আবার আগামী সপ্তায় মুন্সিগঞ্জ যাইতে হইব।

শুনে কেউ কোনো কথা বলে না। উদাস হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। রতনার বুড়ো বাপ আস্তেধীরে নদীর খাড়া পাড় ভেঙে উপরে উঠে যায়।

বাচ্চু বলল, ল বাইত যাইগা। আইজ আর ভাল্লাগতাছে না।

খোকা বলল, বাইত গিয়া কী করুম?

এহেনে বইয়াই বা কী হইব? খবর তো পাইলামঐ।

দুলাল বলল, টাইম কাডান লাগব না! বাইত গিয়া কী করুম!

তাইলে তরা বয়। আমি যাই।

বাচ্চুর মুখে ভেঙে পড়ার চিহ্ন। বাচ্চুটা বড় অস্থির স্বভাবের। অপেক্ষা সইতে পারে না।

নিতাইচরণ বলল, ইলশামাছের জন্মবেত্তান্ত হুনবা কইলা...

আরেক দিন। আইজ মন ভালো না।

সবাই বোঝে রতনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছে বাচ্চু।

বাচ্চু তারপর ভাঙাচোরা মানুষের মতন জেটি থেকে নামে। তার দেখাদেখি খোকা দুলাল। বুড়ো নিতাইচরণও।

নদীর খাড়া পাড় ভাঙার পর পাঁচ সাতকানি বাঁজাজমি। সাদা বেলেমাটি বুকে উজবুকের মতন পড়ে আছে জমিটা। খানে খানে শেয়ালকাঁটার ঝোপ। তারপর বাজার খোলার মাছচালা, দোকানপাট।

বাজারখোলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে দুলাল বলল, বাচ্চু, তুই এত অস্থির হচ ক্যান? তুই লেখাপড়া জানা পোলা, তুই আমগ সাহস দিবি। অহন দেহি তুইঐ বেশি মন খারাপ করোচ!

বাচ্চু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কথা বলে না।

দুলাল বলল, আরো খারাপ টাইম আমাগ সামনে। আইজ হউক কাইল হউক রতনা একদিন ফিরা আইবঐ। রতনারে কোনো হালায় বাইন্ধা রাখতে পারব না। তয় রতনা ফিরা আহনের পর কী হইব চিন্তা কর।

অস্ত্রপাতি কিছু নাই আমাগ। রতনা ফিরা আহনের পর অস্ত্র জোগাড় করতে হইব। তারবাদে হইব খেলা।

নিতাইচরণ ছিল পিছনে। হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে পড়েছে। বয়সের ভার। পেছন থেকেই গলা খাঁকারি দেয় নিতাইচরণ। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে, আমার বয়স হইল আড়াই কুড়ি। এই বয়সে দুইখান স্বাধীনতা দেখলাম।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দুলাল বলল, আরেকখানও দেখবেন। দেরি করেন, রতনা ফিরা আসুক। যুদ্ধ কারে কয়, স্বাধীনতা কারে কয় দেখবেন। আগের দুইখান যুদ্ধ হইছে বাইরের শত্রুর লগে, এইবারের যুদ্ধখান হইব ঘরের শত্রুর লগে।

১৯৮০

পরবর্তীকাল

ছেলেটি রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। তখন দুপুরবেলার তীব্র রোদ ছড়িয়ে ছিল শহরের আনাচেকানাচে। ভ্যাপসা গরমে কাঁঠাল পেকে ফেটে গেলে, কাঁঠালের ভেতর থেকে যে রকম চোখ ধাঁধানো হলদে একটা আভা বেরোয়, রোদের রং ছিল সেরকম। দুটো বেজে গেছে কয়েক মিনিট আগে। এই সময় রিকশা পাওয়া মুশকিল। দুটো বাজে রিকশাওয়ালাদের বদলির সময়। দুটো বাজার খানিক আগে থেকেই রিকশাওয়ালাদের মধ্যে সময়মতো মালিকের চোখের সামনে গিয়ে পৌঁছানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। তখন নিজের এলাকামুখী সওয়ারি না পেলে রিকশায় তোলে না তারা।

দুটো বাজার খানিক পরই ভাতপানি খেয়ে, পান চিবাতে চিবাতে কিংবা বিড়ি-সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে তরতাজা রিকশাওয়ালারা বেরোবে। আয়েশি ভঙ্গিতে রিকশায় প্যাডেল মারতে মারতে সওয়ারি খুঁজবে। ছেলেটি সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গরমে ঘামছিল ছেলেটি। আর উদ্‌গ্রীব হয়ে একবার হাতঘড়ির দিকে, একবার সামনের বড় রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। খালি রিকশা আসে, খালি রিকশা যায়। খালি রিকশা দেখলেই ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, যাবে নাকি?

কেউ রাজি হয় না।

আসলে যেসব রিকশার উদ্দেশে সে জিজ্ঞেস করছিল, তাদের প্রত্যেকেরই তখন বদলির সময়।

এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা কেউ রিকশার ভাড়া ঠিক করে না। খালি পেলেই লাফিয়ে ওঠে। অমুক জায়গায় যাও, তমুক জায়গায় যাও।

কিন্তু ছেলেটির ভাগ্য খারাপ। তার গন্তব্যের দিকে যেতেই রাজি হচ্ছে না কোনো রিকশাওয়ালা। দু-একটায় লাফিয়ে চড়তে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়েছে। রিকশাওয়ালা হা হা করে জিজ্ঞেস করেছে, কই যাইবেন ছাব?

বাধ্য হয়ে তাকে জায়গার নাম বলতে হয়েছে।

তারপর প্রত্যাখ্যান। ভেতরে ভেতরে খুব রেগে যাচ্ছিল সে। হয়তো একটা সুন্দর জায়গায় যাচ্ছে সে। মেজাজ খারাপ করে সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। নয়তো যে-কোনো একটা রিকশায় চড়ে বসে থাকত। রিকশাওয়ালা হাজার অজুহাত দেখালেও নামত না। জায়গামতো রিকশাটাকে নিয়ে ছাড়ত। বেশি বাড়াবাড়ি করলে রিকশাওয়ালার নাকমুখ ফেটে যেত। কেউ ঠেকাতে পারত না। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরকম কিছু করতে চায় না সে। মেজাজ খারাপ নিয়ে প্রিয় সেই জায়গায় যেতে চায় না। সুতরাং ছেলেটির মন খারাপ হয়ে যায়। বারবার হাতঘড়ি দেখে। তার খুবই জরুরি দরকার। হয়তো বা ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে সে। সিনেমা হলে হয়তো বা তার অপেক্ষায় আছে প্রেমিকা কিংবা প্রিয়তম বন্ধুরা। কিংবা সে হয়তো গোপন কোনো জায়গায় মিলিত হতে যাচ্ছে প্রিয়তমা কোনো যুবতীর সঙ্গে। সময় দেয়া আছে। সেই মূল্যবান সময়, হায় বয়ে যায়, বয়ে যায়। ছেলেটি রিকশা পায় না। তার প্রিয়দর্শন মুখে একসঙ্গে খেলা করে অসহায়ত্ব, বিরক্ত এবং বিষণ্নতা। ছেলেটি মন খারাপ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। খালি রিকশা ছাড়া অন্য কোনো দিকে তার মনোযোগ নেই।

তবে ছেলেটির দিকে মনোযোগ ছিল পথচারীদের।

তখন অফিস ছুটির সময়। ছেলেটি যে এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিল তার চারপাশে ম্যালা অফিস-আদালত, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। ছুটির সময় বলে রাস্তায় মিছিলের মতো লোক চলাচল ছিল। বেশিরভাগই অফিসফেরত ক্লান্ত মানুষের দল। তারা সবাই একপলক হলেও ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

ছেলেটি ওসব একদম খেয়াল করে না। কোথাও কেউ অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। কে? প্রেমিকা! ছেলেটি তার কাছে যাবে। ছেলেটি তার প্রিয়তম মানুষের কাছে যাবে।

ছেলেটি দেখতে চমৎকার। একুশ বছর বয়স। এই ডিসেম্বরে বাইশে পড়বে। লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। স্বাস্থ্য বেশ

ভালো। ক্লিন শেভড। গায়ে নীল রঙের হাতাকাটা টি-শার্ট। টি-শার্টের বুকে মাইক্রোফোন হাতে উন্মত্ত ভঙ্গিতে পোজ দিয়ে আছে বর্তমান পৃথিবীর সবচাইতে খ্যাতিমান যুবক গায়ক মাইকেল জ্যাকশন। ইংরেজি বাঁকা হরফে, সাদা রঙে মাইকেল জ্যাকশন নামটা লেখা আছে। ছেলেটির মাথার চুল নিগ্রোদের মতো কার্ল করা। বাগজো কোম্পানির ছাই রঙের প্যান্ট পরা সে। কোমরে একই কোম্পানির সাদা বেল্ট। বাঁধার পরেও নাভির নিচে বিঘত খানেক ঝুলে আছে বেল্টটা। এটাই এখনকার ফ্যাশান।

ছেলেটির পায়ে ছিল অলিম্পিক লেখা ঘি রঙের কেডস। এক হাতে কালো বেল্টের ছোট্ট ঘড়ি। অন্যহাতে তামার পাতের বালা। হাত কামড়ে লেগে আছে বালাটা। হাতটা বেশ লোমশ।

বাড়ি থেকে বেরোবার আগে শরীরে খুব করে ব্রুট সেন্ট স্প্রে করেছে সে। দুপুরের তিরতিরে হাওয়ায় ছড়িয়ে ছিল ব্রুটের মৃদু অথচ পুরুষালি সুবাস।

একসময়, একটা পা নেই, ক্রাচে ভর দেয়া এক মানুষ ক্রাচে ঠুক ঠুক শব্দ তুলে রাস্তার মোড় পেরিয়ে ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসেন। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স হবে তাঁর। ভাঙাচোরা শরীর। চেহারায় কঠিন পরিশ্রমের ছাপ। দাড়ি-গোঁফে একাকার মুখটা শুকনো। কোটরে বসা চোখ দুটো ফ্যাকাশে। মাথায় মাকড়সার জালের মতো উসকোখুসকো চুল। কতকাল তেল-সাবান পড়ে না চুলে কে জানে! পরনে জীর্ণ, ধূলিমলিন খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি। একটা পা নেই বলে পাজামার সেই অংশটা হাঁটাচলার তালে তালে টলমল করে নড়ছে।

একটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে টাইপিস্টের কাজ করেন তিনি। দশটা-পাঁচটা অফিস তাঁর। সরকারি প্রতিষ্ঠান নয় বলে তাঁর কাজটা দীর্ঘক্ষণের। মাঝখানে দুপুর একটা থেকে দুটো অব্দি বিরতি। তখনো অফিস থেকে বেরোন না। ছোট্ট টিফিন বক্সে করে আনা শুকনো দুখানা রুটি আর মুখে লাগে না এমন একটু ভাজিভুজি কিংবা আগের রাতের খাদ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখা তরকারি দিয়ে দুপুরের খাবারটা অফিসে নিজের টেবিলে বসেই সারেন। তারপর একটা স্টার সিগ্রেট ধরিয়ে আনমনা হয়ে থাকেন। ওই সময় নিজের জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে তাঁর। সুখের দিন, দুঃখের দিন এবং ভয়াবহ এক যুদ্ধের স্মৃতি তাঁকে পুরো লাঞ্চ আওয়ারটা আনমনা করে রাখে।

আজ লাঞ্চ আওয়ারে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি। বাসায় তাঁর বৃদ্ধা মা অসুস্থ। মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন তিনটের সময়, সময় দিয়েছেন ডাক্তার। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসায় যাওয়া দরকার তাঁর। ক্রাচ ঠুকে ঠুকে যত দূরে সম্ভব দ্রুত পায়ে চলছিলেন তিনি। রিকশায় চড়ার মতো আয়েশ তিনি কখনো করতে পারেন না। তাঁর যা মাসিক আয় তাতে তিনটি ভাইবোন, বৃদ্ধা মা এবং বাসা ভাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে একটি পয়সাও বাড়তি খরচের কথা ভাবতে পারেন না তিনি। ভাইবোন তিনটি আবার স্কুল-কলেজে পড়ে। এই চাকরির আয়ে সংসারটা তিনি চালাতেই পারতেন না, যদি তাঁর কলেজে পড়া ভাইটি দু-তিনটে টিউশানি না করত। বোন দুটো পাড়ার বউ ঝিদের ছায়া-ব্লাউজ, সালোয়ার-কামিজ, ছোট ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সেলাই করে কিছু পয়সা আয় না করত।

তিনি থাকেন শহরের অতিশয় নিম্নবিত্ত ধরনের একটি জায়গায়। প্রায় বস্তিমতো জায়গা। একটা টিনের এক চালার মাঝখানে বাঁশের বেড়া দিয়ে দুটো রুম করা হয়েছে, এই তাঁর বাসা। সেখানে পাঁচজন মানুষ কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকে।

বাসা থেকে তাঁর অফিসের দূরত্ব, রিকশায় গেলে তিন টাকা। বাঁধা রেট। আসা-যাওয়া ছটাকা। ছুটিছাঁটার দিন বাদ দিয়ে মাসে কম করে দেড় শো টাকা। এই খরচটা তিনি করবেন কোত্থেকে? তাঁর মাস মাইনেই তো সাড়ে চার শো টাকা। এই সাড়ে চার শো টাকার চাকরি জোটাতেই তো তাঁর, স্বাধীনতার পর পুরো দুটো বছর, প্রতিদিন ছ-সাত ঘণ্টা করে সময় বিভিন্ন অফিসে ধরনা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

তাঁর তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতাও নেই। দুবার পরীক্ষা দিয়েছেন, বিএ পাস তিনি করতে পারেননি। আইএ পাস সম্বল নিয়ে বাংলাদেশের চাকরি পাওয়া যায়! তাঁর ওপর একটা পা নেই!

এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, টাইপটা শিখে ফেল, চাকরি পেতে সুবিধে হবে।

তিনি টাইপ শিখলেন। টাইপিস্টের চাকরি পেলেন। তাও ক্রাচে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে কতকাল বিভিন্ন অফিসে ধরনা দেয়ার পর।

চাকরি পেতে তাঁর প্রধান অন্তরায় হয়েছিল একটি পা। যে-কেউ পা দেখেই তাঁর সব যোগ্যতা নাকচ করে দিত। ওই মুহূর্তগুলো ছিল তাঁর

সবচাইতে দুঃখের সময়। তাঁর তখন চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করত, তোমরা কি জানো, আমি আজন্ম এক পায়ের অধিকারী নই। এই সুন্দর দেশটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে গিয়েছিলাম আমি। তোমরা তা পেয়েছ কিন্তু আমাকে হারাতে হয়েছে একটি পা।

কখনো চেঁচিয়ে ওঠা হয়নি তাঁর। কখনো বলা হয়নি এইসব কথা। মনের সব কথা মনেই রয়ে গেছে।

তবু এই চাকরিটা তাঁর হয়েছিল। একজন দয়া করে পাইয়ে দিয়েছিল। তিন শো টাকা মাইনেয় ঢুকে এখন সাড়ে চার শো। এই সাড়ে চার শো টাকা এখন তাঁর জীবনের চেয়েও মূল্যবান। প্রতিটি পাই-পয়সা তাঁকে নিখুঁত হিসেব করে চলতে হয়। সুতরাং রিকশায় চড়ার ক্ষমতা কোথায় তাঁর। পায়ে হেঁটে অফিস করেন তিনি। একটা পা নেই বলে স্বাভাবিক মানুষের মতো হাঁটাচলা করতে পারেন না। যেটুকু পথ হাঁটতে একজন স্বাভাবিক মানুষের বিশ মিনিট সময় লাগে, সেখানে তাঁর লাগে এক ঘণ্টা।

সকাল দশটায় তাঁর অফিস। অন্য লোকেরা দশটার অফিস করতে বেরোয় সাড়ে নটা পৌনে দশটায়। তাঁকে বেরোতে হয় সাড়ে আটটায়। ক্রাচে ভর দিয়ে, ঘামে নেয়ে তিনি যখন অফিসে পৌঁছান তখন দশটা বাজতে পাঁচ দশ মিনিট বাকি থাকে। ছুটির পর অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে তাঁর সন্ধে বয়ে যায়। চাকরিটাকে তিনি প্রাণের চেয়েও অধিক মায়ায় আঁকড়ে ধরে আছেন। এক মিনিট লেট করে কখনো অফিসে যান না। ছুটির এক মিনিট আগে অফিস থেকে বেরোন না। অল্পবিস্তর শরীর খারাপ পাত্তা দিয়ে একটি দিন ছুটি নেন না। হাতে কোনো কাজ জমতে দেন না। খটাখট টাইপরাইটার চালিয়ে যান। টাইপরাইটারের খটাখট শব্দের ভেতর কখনো কখনো এতটা মগ্ন হয়ে যান, যান্ত্রিক শব্দটা আর কানে লাগে না তাঁর। সেই শব্দের ভেতর তিনি শুনতে পান, স্বাধীনতা স্বাধীনতা। বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

এই দুটো শব্দ এতটা আচ্ছন্ন করে রাখে তাঁকে, কখন হাতের সব কাজ শেষ হয়ে যায়, টের পান না তিনি। কখন অফিস ছুটির সময় এগিয়ে আসে, টের পান না।

দীর্ঘকালের চাকরিজীবনে আজ প্রথমবার লাঞ্চ আওয়ারে ছুটি নিতে হয়েছে তাঁকে। বৃদ্ধা মা অসুস্থ। মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন। ডাক্তার

তিনটের সময় দিয়েছেন। দ্রুত বাসায় পৌঁছোনো দরকার। এই কারণে তিনি আগেই ভেবে রেখেছিলেন, তিনটা টাকা ব্যয় হলেও রিকশায় চড়তে হবে আজ। সময়ের হেরফের হলে রোগীই দেখবেন না ডাক্তার। মাকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে।

অসুস্থ মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথাটা, কাল ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েনমেন্ট করার পর থেকে ঘুরেফিরে তাঁর মনে আসছিল। আজ অফিসে টাইপরাইটার চালাতে চালাতেও মনে হয়েছে। টাইপরাইটার চালানটাকে তাঁর বরাবরই সেই ভয়াবহ যুদ্ধের মতো মনে হয়। আসলে এও তো এক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের তুলনায় কোনো অংশেই কম ভয়াবহ নয়। বেঁচে থাকার যুদ্ধ। এই কারণেই বোধহয় টাইপরাইটারের শব্দে আনমনা হয়ে যেতে যেতে, খটাখট শব্দের ভেতর থেকে তাঁর কানে যখন তখন ভেসে আসে, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। কখনো কখনো স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, কথাটা আজ যতবার তাঁর মনে এসেছে, ততবারই ভুল হয়ে গেছে। মনে হয়েছে শত্রুর গুলিতে গুরুতর আহত কোনো সহযোদ্ধাকে কাঁধে করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর। তিনি সেই দায়িত্ব পালনে যাচ্ছেন।

অফিস থেকে বেরিয়ে আনমনে রিকশার খোঁজ করতে করতে ক্রাচে ভর দিয়ে রাস্তার মোড় পেরিয়ে আসেন তিনি। এই সেই মোড়, যেখানে রিকশার অপেক্ষায়, চেহারায় পৃথিবীর যাবতীয় বিতৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ছেলেটি।

ছেলেটির কাছাকাছি আসতেই হাওয়ায় সেন্টের মৃদু গন্ধটা পেয়েছিলেন তিনি। একটু হেঁটেই ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে তাঁর শরীর। খদ্দরের পাঞ্জাবি ভিজে সেঁটে গেছে পিঠের সঙ্গে, বুকের সঙ্গে।

ছেলেটির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন তিনি। আর হাঁটবেন না। এখানে দাঁড়িয়েই রিকশার অপেক্ষা করবেন। রিকশায় যখন চড়তেই হবে, তাহলে আর হেঁটে লাভ কী! হেঁটে তো আর সময়মতো বাসায় পৌঁছোতে পারবেন না!

ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে হাঁ করে শ্বাস টানলেন তিনি তারপর অপেক্ষমাণ ছেলেটির দিকে তাকালেন। তাকিয়ে রইলেন।

এই বয়সের ছেলেদের দেখলে সব সময়ই মুগ্ধ চোখে তাকান তিনি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের ওই বয়সটায় ফিরে যান। এরকম বয়স

একদা তাঁরও ছিল। তখন দেশটা ছিল পরাধীন। এরা পরাধীন নয়। স্বাধীন দেশের সুখী যুবক। তারা ছিল পরাধীনতায় দুঃখী।

কিন্তু ছেলেটাকে কেমন চেনা চেনা লাগে তাঁর। কোথায় কার চেহারার সঙ্গে যেন মিল। ছেলেটাকে কোথায় দেখেছেন তিনি! কোথায়? কার চেহারার সঙ্গে মিল!

কার?

মনে পড়ে, সব মনে পড়ে তাঁর।

ছোট্ট একটা গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি বললেন, এই যে আপনি...

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। একপলক তাকিয়ে তাঁর পোশাক-আশাক, চেহারা এবং ক্রাচ দেখে নিল।

তিনি বুঝতে পারেন ছেলেটি তাকে পথের ভিখিরি টিখিরি কিংবা ওরকম কিছু ভাবছে। তিনি কিছু মনে করলেন না। ভারী, পুরুষালি গলায় বললেন, মানে তুমি রেন্টু না? মণির ভাই...

এ কথায় ছেলেটি একটু চমকায়। কিন্তু মুখের বিরক্ত ভাবটা বদলায় না তার। বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে চিনতে পারলাম না।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, আমি হেলাল।

ছেলেটি চিনতে পারল না। ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

হেলাল বললেন, রেন্টু, তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ। আমি তোমাকে অনেক ছোট দেখেছি। হাফপ্যান্ট পরা। কত দিন তুমি আমার কাঁধে চড়েছ।

রেন্টু কথা বলে না। মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যায় হেলালের এসব কথা একদম ভালো লাগছে না তার।

হেলাল সব বুঝতে পারেন। ছেলেটি রেন্টু না হয়ে অন্য কেউ হলে হয়তো আর কথা বলতেন না তিনি। কিন্তু রেন্টুর সঙ্গে না বলে পারবেন কেমন করে! তা ছাড়া একটি কথা তো তাঁকে জানতেই হবে। এতকাল পর একটি সূত্র পেয়েছেন। তার কথা জানবেন না! সে কোথায় আছে, কেমন আছে!

হেলাল একটু থেমে বললেন, মণি কোথায় আছে?

আপা তো স্টেটসে। দুলাভাই ওহাইয়ো ইউনিভার্সিটিতে আছেন। অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর।

বাচ্চাকাচ্চা?

একটি মেয়ে।

দেশে আসে না?

বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিল। আগামী বছর আবার আসতে পারে।

শুনে হেলালের বুক তোলপাড় করে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। রেন্টু তা খেয়াল করে না।

হেলাল একসময় বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন, রেন্টু?

রিকশার জন্য।

এ সময় রিকশা পাওয়া মুশকিল।

রেন্টু এ কথার কোনো জবাব দিল না।

হেলাল বললেন, কোথায় যাবে?

যাব এক জায়গায়। গার্লফ্রেন্ড ওয়েট করছে।

শুনে মনে মনে হাসলেন হেলাল। এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। যে-কোনো কথা সরল উচ্চারণে দীপ্তভাবে বলে দেয়। কোনো ভান-ভণিতা নেই, মিথ্যাচার নেই। অথচ হেলালদের এই বয়সে সত্য কথা সরলভাবে বলার সাহস ছিল না। গার্লফ্রেন্ড কাকে বলে তাঁরা জানতেন না। তাঁরা জানতেন প্রেমিকা। হেলালের ছিল মণি। কিন্তু মণির কথা হেলাল ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানত না। দেখা হলেও তাঁরা বেশি কথা বলতে পারতেন না। তাদের যাবতীয় কথা হতো চিঠিতে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি প্রেমপত্র লেখে! ওদের কি একজন মাত্র প্রেমিকা থাকে! স্বাধীনতা কি তাহলে এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে! পুরনো মূল্যবোধগুলো কি ওরা একদম ভেঙেচুরে দিয়েছে!

শাবাশ! এই তো স্বাধীনতা!

হেলালের মুখে এক টুকরো মোহন হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তেই আরেকটি অমোঘ প্রশ্ন এসে আঘাত করে তাঁকে। রেন্টুরা কি মনে রেখেছে, ওদেরকে আজকের এই সুন্দর জীবনে পৌঁছে দেয়ার জন্যে দেশের মানুষ মেতে উঠেছিল ভয়াবহ এক যুদ্ধে।

হেলাল মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। একাত্তরে তিনি তাঁর পিতাকে হারিয়েছেন। হেলালকে খুঁজতে এসে না পেয়ে তার পিতাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান আর্মি। পিতা আর ফিরে আসেননি। যুদ্ধ থেকে হেলাল ফিরে এসেছিলেন একটি পা হারিয়ে। ফিরে এসে দেখেছিলেন তাঁর প্রেমিকা অন্যের স্ত্রী হয়ে গেছে। পিতাহীন সংসার এলোমেলো হয়ে গেছে। এবার তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হবে।

হেলাল তখন বিএ ক্লাসের ছাত্র। সামনে তাঁর সুন্দর ভবিষ্যৎ ছিল। হলো না, সুন্দর ভবিষ্যতে যাওয়া হলো না হেলালের। সংসারের ঘানি টানার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনাটাও চালিয়ে ছিলেন কিছুদিন। হলো না, পর পর দুবার পরীক্ষা দিয়েও পাস করা হলো না। পাঁচজন মানুষের সংসার টেনে কেমন করে হবে! কিন্তু এসব নিয়ে হেলালের কোনো দুঃখ নেই। স্বাধীনতার জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ তো করতেই হবে।

হেলাল ভাবেন, এইভাবে ভাবেন। রেন্টুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেও ভাবছিলেন। এই কথাই ভাবছিলেন। তখন একটা খালি রিকশা এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। রিকশাওয়ালার আয়েশি ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, এইমাত্র রিকশা নিয়ে বেরিয়েছে। খালি রিকশা দেখেই মায়ের কথা মনে পড়েছে হেলালের। মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সময় হয়ে আসছে। ব্যস্ত ভঙ্গিতে রিকশাটা ডাকতে যাবেন হেলাল তার আগেই রেন্টু লাফ দিয়ে রিকশায় চড়ে বসল। যাও।

হেলাল কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলেন রিকশাটা দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। তবু দুঃখিত হতে পারলেন না হেলাল। ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে মনে রেন্টুদের উদ্দেশে বললেন, সুখে থেকো, সুখে থেকো। তোমাদের সুখী করবার জন্যই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম আমরা। স্বাধীনতা এনেছিলাম। আমাদের অনেক কিছু হারাতে হয়েছে। তোমাদের যেন কোনো কিছু হারাতে না হয়।

দুপুরের মৃদু হাওয়ায় টলমল করে নড়ছিল হেলালের পাজামার একটা পা।

১৯৮৮

মানুষ কাঁদছে

হাতের তাস ছুড়ে ফেলে রহিম বলল, কাউলা, সাফল দে।

কালু সবগুলো তাস একত্র করে ফরফর শব্দে সাফল দিল। হাতে সিগারেট ছিল, কায়দা করে ঠোঁটে গুঁজে দ্রুত নটা করে তাস বেটে দিল।

রহিম তিনটা তিনটা করে তাস তোলে। প্রথম তিনটা তুলে বেশ খুশি। চার পাঁচ ছয়, রান। পরের তিনটা তুলে দেখে দুটো গোলাম। সবশেষের তিনটা তোলার সময় রহিম মনে মনে একটু আল্লাহ খোদার নাম নেয়। এই দান না পেলে পকেট একদম ফাঁকা হয়ে যাবে। সকালবেলা নাশতা খাওয়া হবে না, খেলাও হবে না। আর যদি আল্লাহ আল্লাহ করে পেয়ে যায়, তাহলে তো কথাই নেই। চার হাত খেলছে। কিট্টি। এক টাকা বোর্ড। একবার পেলেই তিন-টাকা। তিন-চারটা দান পেলে দিনের খরচা উঠে যাবে। তার ওপর আজ আবার মঙ্গলবার। নটা দশটার দিকে গোডাউন খুলবে। কন্ট্রাকটররা ট্রাক নিয়ে, ঠেলাগাড়ি নিয়ে আসবে সিমেন্ট নিতে। বকশিশ তো দু পাঁচ টাকা পাওয়া যাবেই। আর যদি আশরাফ মিয়ারে একটা ধরাইয়া দেওন যায়...

এসব ভাবতে ভাবতে শেষ তিনটা তাস খোলে রহিম। না কিছু হয়নি। ন'টা তাস একত্র করে তবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানোর চেষ্টা করে রহিম। ওই। চার পাঁচ ছয়, রান। তারপর গোলামের জোড়া। শেষবার, কিচ্ছু না। বিবি টপ।

তবু খেলাটা চালিয়ে যায় রহিম।

প্রথমে তাস ফেলে নোয়াব। তিনের ট্রায়ো। দেখেই হয়ে যায় রহিমের। নিজের তাসগুলো সব ফেলে দেয়। বোর্ডে চারটা এক টাকার নোট। একপলক টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে খালপাড় থেকে উঠে আসে রহিম।

নোয়াব, কালু আর লাটমিয়া খেলবে সারা দিন। কারবারই এটা। এলাকার পুলিশের সঙ্গে লাইন করা আছে। ধরবে না। এসব ভাবতে ভাবতে স্টেক দেওয়া ইটের ফাঁকফোকর দিয়ে বটতলায় আসে রহিম।

বটতলায় একটা চায়ের দোকান। সামনে দুখান বেঞ্চ পাতা, ভিতরে চেয়ার-টেবিল। লোকজন বাইরে বসে চা খায়, ভেতরে বসে খায়। বেশিরভাগই লেবার, রিকশাওয়ালা। কিছু আছে ড্রাইভার। কখনো দু-চারজন কন্ট্রাকটরও বসে। চা খায়, সিগারেট খায়, তারপর চলে যায়।

রহিম আশায় আশায় চায়ের দোকানটায় যায়। যদি কোনো কন্ট্রাকটরের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে বলবে, স্যার নাশতা করান।

কেউ খেতে থাকলে তার সামনে গিয়ে খাওয়ান বললে লোকে না খাওয়ায় কেমন করে!

এই কথাটা ভেবে রহিম বেশ খুশি। ভাবে, মাথায় কম বুদ্ধি না আমার!

তো রহিমের বরাত ভালো। দোকানের ভেতর বসে আছে তিনজন। শওকত সাবের ম্যানেজার, আরিফ সাব আর আশরাফ মিয়া। আশরাফ মিয়া তার সাইকেল রেখেছে বটগাছটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে। সেখানকার মাটিতে দুটো কাক চরছে। আর গাছটার ওপর কা কা করছে কতগুলো। চারদিকে রোদ, কড়া রোদ। রহিম টের পায় এটুকু হেঁটেই গা জবজব করছে ঘামে।

চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস টানে রহিম। খালপাড়ের মাটিতে বসে খেলেছে, পাছায় লেপটে আছে সাদা মাটি। রহিম খেয়াল করেনি। দোকানের ভেতর থেকে আশরাফ মিয়া বলল, ও রহিম বাদশা, তোমার পাছায় কী?

শুনে চায়ের দোকানের যে ছেলেটা কড়াইয়ে টুপটুপ করে ডালপুরি ছাড়ছিল সে গলা খুলে হেসে ওঠে। হাসে রহিমও। অন্যসময় হলে হয়তো রেগে যেত। এখন রাগ করা যায় না। আশরাফ মিয়াকে পটিয়ে নাশতাটা খেতে হবে।

রহিম দোকানে ঢোকে। নাশতা খাওয়ান ভাই।

আশরাফ মিয়া চা খাচ্ছিল। বলল, একটা পাট্টি ধর।

ধরুম নে।

রহিম আশরাফ মিয়ার পাশে বসে। চায়ের দোকানের ছেলেটাকে বলে, চাইরডা ডাইল পুরি দে আর এক কাপ চা।

শওকত কন্ট্রাকটরের ম্যানেজার বলল, কি রে রহিম, খবর কী?

রহিম ডালপুরি খেতে খেতে বলল, ভালাই।

তর বাড়ির ভাড়া পাছ না?

রহিম কথা বলে না। হাসে।

রহিমের চারটা বাড়ির গল্প সবাই জানে। এই নিয়ে টিটকারিও মারে, হাসাহাসি করে। রহিমের তাতে কিছু যায়-আসে না। রহিম জানে, সে চারটা বাড়ির মালিক। থাক না তাতে অন্যলোক, মালিক তো রহিম!

চা খেতে খেতে রহিম তারপর বাড়িগুলোর কথা ভাবে।

সামনের রাস্তা দিয়ে ঠিক তক্ষুনি লাল হোন্ডা চালিয়ে ওভারসিয়ার কেরামত যায়। পেছনে দুটো ট্রাক, কয়েকটা ঠেলাগাড়ি। কন্ট্রাকটররা আসছে। কেরামত ওভারসিয়ার এক্ষুনি গোডাউন খুলবে। তারপর শুরু হয়ে যাবে সিমেন্ট দেওয়া।

হোন্ডার শব্দ পেয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরোয় শওকত কন্ট্রাকটরের ম্যানেজার, আরিফ সাব। সবশেষে আশরাফ মিয়া। রহিম ততক্ষণে আশরাফ মিয়াকে পটিয়ে একটা স্টার সিগারেটও জোগাড় করে ফেলেছে। এখন বেদমসে টানছে। চেহারায় ফুর্তি ফুর্তি ভাব।

খানিক আগে সামনের রাস্তা দিয়ে যে ট্রাকগুলো গেছে তার চিহ্ন এখন রোদে হাওয়ায় ভাসছে। রহিম উড়ন্ত ধুলোবালির দিকে তাকিয়ে কী জানি কী কারণে সিগারেট টানতে টানতে গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আরিফ সাহেব আর আশরাফ মিয়া অদূরে খুব নিচু গলায় কী কী সব আলাপ করছে। সেদিকে তাকিয়েই রহিম বুঝে গেল, মাল কেনার লাইন করছে আশরাফ। আশরাফকে ধরতে হয়। দশ টাকার একটা নোট খসাতে হয়।

কিন্তু ওভারসিয়ার সাব এসে গেছে, রহিমকে একবার গোডাউনের দিকে যেতে হয়, চেহারাটা একবার দেখাতে হয়। চাকরি না!

যখন যাওয়ার কথা ভাবছে ঠিক তখুনি আশরাফ মিয়া ডাকল, হোন রহিম।

রহিম দৌড়ে যায়। পয়সাপাতির লাইন হইব মনে হয়।

আশরাফ মিয়া বলল, দুইডা ঠেলা লইয়া আয়।

কই যাইবো?

খিলগাঁও।

ভাড়া?

আবে তোর মাথায় ঘিলু নাই? দাম কইরা আনবি।

আইচ্ছা।

তাড়াতাড়ি যা।

রহিম একটু মাথা চুলকায়। পরনের খাকি শার্টটার খুঁট নাড়ে। যাওন লাগব তো টিকাটুলির মোড়ে। রিকশা ভাড়া দেও।

আমার সাইকেলডা লইয়া যা।

রহিম ভালো সাইকেল চালাতে পারে না। কোন ছেলেবেলায় ধূপখোলা মাঠে কয়েক দিন শিখেছিল। তারপর সারা জীবনে বার চারেক। রহিম কি পারবে!

কিন্তু আশরাফ মিয়া রিকশা ভাড়া দেবে না। হেঁটে গেলে যেতে-আসতে আধঘণ্টা। ওভারসিয়ার রেগে যাবে। আর না গেলে আশরাফ মিয়ার কাছ থেকে লাল দশ টাকার নোটটা আদায় করা যাবে না।

রহিম আল্লাহর নাম নিয়ে বটতলা থেকে আশরাফ মিয়ার ঝরঝরে সাইকেলটা নেয়। বার দুয়েক চেষ্টা করে চড়তে যাবে, ডাকল শওকত কন্ট্রাকটরের ম্যানেজার। কই যাইতাছো রহিম বাদশা?

টিকাটুলি যামু।

হোন। বলে ম্যানেজার সাহেব তিনটা কড়কড়া দশ টাকার নোট বের করে। টাকাগুলো দেখেই রহিমের বুড়ো চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। কিছু আনতে দিলেই হয়, একটা টেকার কাম হইব।

ম্যানেজার সাহেব বলল, এক প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ আনবি।

রহিম হাসে। কার লেইগ্যা? আইজকাল ফিফটি ফাইব খান নি?

না বে। একজনরে দেওন লাগব।

রহিম বুঝে যায় ম্যানেজার সাব ঘুষ দিব।

টাকাটা পকেটে পুরে সাইকেলে চড়ে রহিম। কয়েকবার চেষ্টা করে চড়ে। দেখে আশরাফ মিয়া, ম্যানেজার আর আরিফ সাহেব খুব হাসে। রহিম গা করে না। টালমাটালভাবে সাইকেলটা চালিয়ে যায়। চালাতে চালাতে নিজের ওপর বেশ খুশিও হয়ে ওঠে একসময়। বা বা, কতদিন বাদে সাইকেল চালাইতেছি! ভালাই তো পারতাছি!

এসফল্ট প্লান্টের মিকচার মেশিনটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে রহিম বোটকা একটা গন্ধ পায়। দুনিয়ার পচাধচা মাল আইনা ফেলায় এহানে। এইডা কুত্তাপচা গন্ধ। টাউনের বেবাক কুত্তা মারতাছে সুঁই দিয়া। মাইরা গাড়ি ভইরা ফালাইয়া যায় এহেনে।

সাইকেলে বসে টালমাটাল অবস্থায়ও সামনের পচা ডোবাটার দিকে তাকায় রহিম। হ, যা কইছিলাম। দেহো কতডি মাইরা হালাইছে! পইচ্চা ফুইল্লা এহেকখান দারোগা হইয়া গেছে।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাইকেল নিয়ে কাত হয়ে পড়ে রহিম। একটু আনমনা হয়ে গেছিল। সামনে উঁচু ঢিবি ছিল, টাল সামলাতে পারে না। পড়ে একদম গড়াগড়ি খায়।

হলে হবে কি, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে ওঠে রহিম। জামাটা লুঙ্গিটা ঝাড়তে ঝাড়তে চারদিকে চায়। কেউ দেখে ফেলেনি তো! দেখলে হাসাহাসি করবে। টিটকারি মারবে। দুয়ো রহিম বাদশা, সাইকেল চালাতে পারে না! পোলাপানে দেখলে আরো খারাপ। ইটা মারব।

রহিম আবার সাইকেলে চড়ে। পচা গন্ধ পেছনে ফেলে, রোদের ভেতর দিয়ে চালিয়ে যায়। ঠেলা ঠিক করতে পারলে নগদ টাকার কাম। আর ম্যানেজার সাবের সিগারেট থেকে এক টাকা, তার ওপর ম্যানেজার সাহেবকে ধরে আরো এক টাকা বকশিশ। মোট বারো টাকার কাম। জুয়ায় হেরেছে ছ' টাকা আর এখুনি কামিয়ে নিচ্ছে বারো টাকা। আবার আশরাফ মিয়ারে একটা পাট্টি ধইরা দিতে পারলে বিশ ত্রিশ টেকার কাম। এই গোটা পঞ্চাশেক টেকা কামাইয়া হালাইতে পারলে...

এই অব্দি ভেবে সুখে বিভোর হয়ে যায় রহিম। তাইলে আইজ রাইতে মেথরপট্টিতে যামু, ভরপেট মাল খামু।

তখন রহিমের সাইকেল পাকা রাস্তায় পড়েছে। দুদিক থেকে শাঁ শাঁ করে আসছে ট্রাক রিকশা বেবিট্যাক্সি। খুব সাবধানে, নরম পায়ে ধীরে সাইকেলটা টেনে নেয় রহিম। আর মনে মনে বিশাল এক সুখে বিভোর হয়ে থাকে।

খানিক দূরে এসে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যে রেললাইন চলে গেছে, কষ্টেসৃষ্টে তার ওপর চড়ে রহিম। টের পায় ঘামে চিরবির করছে শরীর। বুড়ো বয়সে সাইকেল টানার কষ্ট কি কম! তবু কষ্টটা গায়ে লাগে না রহিমের। বিশ-পঞ্চাশ টাকার কাম হয়ে যাবে আজ। আহা, রাতের বেলা পুরা একটা বোতল!

এসব ভাবতে ভাবতে ঢালে নামে রহিম। ঢালে নামার সঙ্গে সঙ্গে টের পায় সাইকেলটা তার আওতায় থাকছে না, পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে। কী করে, রহিম এখন কী করে! প্রাণপণে দাঁত মুখ খিঁচে ব্রেক চাপার চেষ্টা করে। কাজ হয় না।

তখনি উল্টা দিক থেকে দুপাশের বাতাস তীব্র বেগে ছিটকে দিয়ে ছুটে আসে মাল বোঝাই পাঁচটনি এক ট্রাক। মুহূর্তে হাঁ করা বিশাল অজগরের মতো টুপ করে গিলে নেয় রহিমকে, সাইকেলটাকে। প্রথমে হজম করে, তারপর উগরে দিয়ে দিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো পৃথিবী জেনে যায় আজ থেকে তার সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির পিয়ন, চারখান বাড়ির মালিক রহিম বাদশার সব সম্পর্ক শেষ।

দুই

আমাদের ট্রাকটা এসেছে বেশ সকালে। দুশো সিমেন্ট যাবে। কাজ চলছে রায়েরবাজারে। বেশ বড় কাজ। চার লাখ আশি হাজার টাকার একটা ডিপ ড্রেন আর ফুটপাত। ছ' ইঞ্চি ঢালাই। কুচি পাথর নেয়া শেষ হয়েছে দশ দিন আগে। ড্রেনের বেড় আর সাইড ওয়ালের জন্য ইট নেয়া বাকি আছে কিছু। হাজার আটেক নিতে হবে আরো। সাইটে রাখার জায়গা নেই বলে আপাতত নিচ্ছি না। কিন্তু প্রায় সবকিছু রেডি থাকার পরও কাজটা শুরু করা যাচ্ছে না। সিমেন্ট ছিল না গোডাউনে। সিমেন্ট উঠেছে পরশু দিন। সাড়ে ছ' হাজার ব্যাগ। তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সিমেন্টের অভাবে কন্ট্রাকটররা সাইট বন্ধ করে বসে আছে। ইনডেন্ট পকেটে নিয়ে ঘুরছে।

এবার তাই সিমেন্ট ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লাইন দিয়েছে সবাই। আমরা সিমেন্ট পাব অনেক। পাঁচ সাত শো ব্যাগের মতো। কিন্তু পুরোটা একবারে দিচ্ছে না। দু-চার দিনের মধ্যে আরো সিমেন্ট উঠবে। তখন পুরোটা দিয়ে দেবে। এবার দুশো ব্যাগ দিয়েছে শুনে আমার স্যার ভীষণ রেগে গেছেন। কাজটা ডিলে হয়ে গেল। একটা কাজ নিয়ে বসে থাকলে তো আর শওকত কন্ট্রাকটরের চলে না। একটার পর একটা কাজ করার অভ্যাস তাঁর। কাজহীন থাকতে চান না ভদ্রলোক। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বলেছিলেন, আপনি অর্ডার দিন স্যার, বাইরে থেকে সিমেন্ট কিনে কাজটা শেষ করে ফেলি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অর্ডার দিলেন না। স্যার আর কী করেন, ন্যাংড়া ঘোড়ার মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই কাজটা চলবে।

স্যার বলেন, কাজে ডিলে হলে লস। খরচা বেড়ে যায়। ধুমধাম কাজ শেষ করে ফেলো, লাভ আছে।

এসব কথার কথা। শওকত কন্ট্রাকটরের সব কাজেই লাভ। মাস্টার লোক। এই বাজারেও ফরটি পার্সেন্ট লাভ তুলে নেবেন যে-কোনো কাজ থেকে। নিজে সাইটে থাকবেন না, কাজের দেখাশোনা সব আমি করি আর ওস্তাগার আছে কাদির। শওকত কন্ট্রাকটরের বাঁধা। এই একজনের কাজ করেই কূল পায় না কাদির।

বছর ভর স্যারের সঙ্গে লেগে আছে কাদির। মাসে দুমাসে পাঁচ-সাত দিন ছুটি পায়। কখনো নাগাড়ে ছ' মাস পায় না। সাইটে ইটের স্টেক দিয়ে তার ওপর ঢেউটিন ফেলে লোকজন নিয়ে থাকে। বাড়ি ফেরে না বহুদিন। টাকা-পয়সার দরকার হলে কাদিরের ছেলে এসে নিয়ে যায়। পয়সা ভালোই কামায় কাদির। ছোটখাটো কন্ট্রাকটরদের চেয়ে বেশি কামায়। যাত্রাবাড়ীতে দোতলা বাড়ি কাদিরের। বড় ছেলেটা কলেজে পড়ে। ছেলেটার কেতা দেখে মনেই হবে না কাদির ওস্তাগারের ছেলে।

তো কাদির বুদ্ধিমান লোক। রোজদরে কাজ করে না। সাবকন্ট্রাকট নেয়। সাব কন্ট্রাকটে অর্ধাঅর্ধি লাভ। তাতে স্যারেরও সুবিধা। ইস্টিমেটটা কাদিরকে বুঝিয়ে দিয়ে, মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে খালাস। কাদির পাকা ওস্তাগার, ঠিকঠাক চালিয়ে নেয়। আমার কাজ হচ্ছে কাদিরের তদারক করা, কাজ ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না দেখা। আর সাইটে ইন্সপেক্টার ওভারসিয়াররা গেলে তাদের খাতির করা। ইঞ্জিনিয়ার আর বিলপত্রের ব্যাপার স্যারই দেখেন।

আজ সিমেন্ট যাবে দুশো বস্তা। কাল রাতেই ট্রাক ঠিক করে রেখেছিলাম। ঠিক করে রাখা মানে কি, ড্রাইভার এনায়েতকে বলে দেয়া আর কি! এনায়েতও স্যারের বাঁধা। রোজ সন্ধ্যায় স্যারের অফিসে এসে খবর নিয়ে যাবে। খেপ থাকলে এনায়েতকে শুধু বলে দেয়া। টাইমলি চলে আসবে, সাইটে মাল পৌঁছে দেবে। টাকাপয়সার ব্যাপারে স্যারের সঙ্গে কথা। আমার ধার ধারবে না। আমার কাজ সাইটে দাঁড়িয়ে থাকা, দরকার হলে আউটফলে আসা আর সন্ধ্যাবেলা স্যারের অফিসে গিয়ে সারা দিনের কাজের একটা ফিরিস্তি দেয়া। সাইটে এক্সট্রা খরচাপাতি হলে তার হিসাব দেয়া। এত পয়সাওয়ালা লোক স্যার, হলে হবে কি, পাই পয়সাটির পর্যন্ত হিসাব নেবে। একটা পয়সা বেশি খরচা হলে তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। এই যেমন আজ একটা ঘাপলা হয়ে গেল। এনায়েত ট্রাক নিয়ে এসে বসে আছে সাতটা থেকে। তবু লাইন এড়াতে পারেনি। তার আগে আরো আটটা ট্রাক, পাঁচ-ছয়টা ঠেলাগাড়ি। এগুলো ভরা হলে মাল পাবে এনায়েত। তার মানে চারটা বেজে যাবে। ওসব দেখেই এনায়েত এসেছিল আমার কাছে। ওভারসিয়ার সাহেবকে এক প্যাকেট সিগারেট দিলে মালটা আগে পাওয়া যাবে। নয়তো এই একটা খেপ দিয়েই এনায়েতের দিন কাবার। পাবে তো দুশো টাকা। দুশো টাকায় লেবার খরচ দিয়ে, তেল খরচ দিয়ে পোষায়! মহাজন কী বলবে! আমি বলি, সিগারেট কিনে দিলে স্যারের কাছে হিসাব দেব কেমন করে?

আমি স্যাররে কমু নে।

ঠিক আছে। আমি তারপর রহিমকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল রহিম এখনো ফিরছে না কেন? গেল তো আশরাফ মিয়ার সাইকেল নিয়ে। অবশ্য আরিফ সাহেবের মাল যাবে চল্লিশ বস্তা। দুটো ঠেলাগাড়ি ঠিক করতে হবে রহিমকে। আজ তো সব ঠেলাগাড়ি আউটফলেই চলে এসেছে। রহিম এখন ঠেলা পাবে কোথায়! কিন্তু রহিম যেই মানুষ, ঠেলা না নিয়েও তো ফিরবে না! কতক্ষণ লাগে কে জানে!

আমি এনায়েতকে বলি, তুমি গিয়ে গাড়িতে বসো, রহিম সিগারেট নিয়ে আসবে।

আপনে গিয়া গেট পাসটা করান।

রহিম আসুক।

এনায়েত চলে যেতে আমি একটা সিগারেট ধরাই।

চায়ের দোকানের সামনে বসে আছে আরিফ সাহেব আর আশরাফ মিয়া। দুজনের চেহারাতেই উৎকণ্ঠা। বুঝতে পারি, রহিমের ওপর রেগে যাচ্ছে ওরা। রহিম এত দেরি করছে কেন?

রহিমের ব্যাপারে আমার তেমন মাথাব্যথা নেই। যখন ইচ্ছে ফিরুক। আমাদের মাল সন্ধ্যায় গেলেই বা কী! লস হলে এনায়েতের হবে। সেটা দেখবেন আমার স্যার। এনায়েতের জন্য আমার এক প্যাকেট সিগারেট ব্যয়, সেটা আমি এনায়েতের নামে খাতায় লিখে রাখব। তখন দুশো টাকা থেকে সিগারেটের দামটা বাদ যাবে কি যাবে না সেটা স্যারের ব্যাপার, এনায়েতের ব্যাপার।

সিগারেট টানতে টানতে আমি বটতলা ছাড়িয়ে দূরে স্কুল বাড়ির মাঠটার দিকে হেঁটে যাই। সবুজ উদাস মাঠখানা চিরবিরে রোদে বোকার মতো পড়ে আছে। দূর থেকে গাঢ় সবুজ ঘাস দেখে আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে। গ্রামের কথা মনে পড়ে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে বৈচির কথা।

আমি বৈচিকে বড় ভালোবাসতাম। আর ভালোবাসতাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আমার নাম মানিক। পিতা মরহুম গফুর খাঁ। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। থানা লৌহজং। গ্রাম মাইজগাঁও। শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি। পেশা শওকত কন্ট্রাকটরের ম্যানেজার। মাস মাইনে সাড়ে চার শো।

আমার বাবা ছিলেন সামান্য কৃষক। চার বোন এক ভাইয়ের সংসার আমাদের। চার কানি জমি ছিল মাইজগাঁওয়ের বিলে। আউশ-আমনে সারা বছর ম ম করত আমাদের বাড়ি। বাবা লেখাপড়া জানতেন না। তবু আমাকে কৃষিকাজে না দিয়ে ব্রাহ্মণগাঁও হাইস্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। খটোমটো করে এসএসসি পাসটা আমি করে ফেলি। তখনই শুরু হলো দুর্দিন। দুটো মেয়ে বিয়ে দিতে বিলের দুকানি জমি গেল বাবার। আমার কলেজে পড়া হলো না। সংসারে দেখা দিল অনটন। আমি তখন বেকার। খেতখোলা দেখাশোনা করব, পারি না। বাবা আমাকে শেখায়নি। ঘুরেফিরে দিন কাটে। সে সময়

একদিন পুবপাড়ার তরফদারদের মেয়ে বৈচির সঙ্গে দেখা। বয়স খারাপ, দেখতে দেখতে বৈচির সঙ্গে হয়ে গেল প্রেম। রূপ ছিল বৈচির। অন্ধকার রাতে সাপের মণি যেমন। আমি রাতবিরাতে বৈচির সঙ্গে দেখা করি। একদিন দেখা না হলে সারা দিন মন খারাপ। ভাতপানি খেতে ভাল্লাগে না। দেখেশুনে বাবা-মা আমার বিয়ের কথা ভাবতে বসে। কোথায় কোথায় কনে দেখে বেড়ায়। কিন্তু আমার মন বলে বৈচি। আমি কার কাছে যাব?

সেই বৈচির সঙ্গে আমার বিয়ে হলো না। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বৈচির বিয়ে হয়ে গেল ধাইধার ব্যাপারিবাড়ি। ব্যাপারিরা পয়সাওয়ালা, তরফদাররাও পয়সাওয়ালা। বৈচিকে সোনায় মুড়ে নিয়ে গেল। বিয়ের দুদিন আগে, একরাতে বৈচি আমার গলা জড়িয়ে কী কান্নাটা যে কাঁদল! বলল, চলো আমরা পালিয়ে যাই।

আমি কাপুরুষ, পালাতে পারিনি। তরফদাররা দেশ-গেরামের মাতব্বর, পয়সাওয়ালা। তাদের বংশের মেয়ে নিয়ে ভাগলে আমাদের বংশ নির্বংশ করে ফেলবে।

বংশের ভয়ে আমি বৈচিকে ছাড়লাম। বৈচির বিয়ে হয়ে গেল। বৈচির স্মৃতি বুকে নিয়ে আমার দিন কাটে।

তারপর কতদিন কেটে গেল। আমার বাপ মরল। বোনগুলো পুরনো সংসার ছেড়ে গেল নতুন সংসারে। এখন বুড়ি মা অন্ধকার বাড়ি আগলায়। আমি মাসকাবারি টাকা পাঠাই। দিন চলে যায়।

আমি কাপুরুষ, কথাটা সত্য। বৈচি চলে যাওয়ার পর আমি আর একজনকে ভালোবাসি, তার নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির জনক। বঙ্গবন্ধু। আমি রাজনীতি করতাম না, রাজনীতি বুঝিও না। তবু মানুষটাকে ভালোবাসি।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা লৌহজং মাঠে। দেখা মানে দূর থেকে দেখা। তিনি ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে, শীতকাল ছিল, পাঞ্জাবির ওপর পরেছিলেন মুজিব কোট, ডান হাত তুলে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমার বুক জুড়ে বৈচিকে হারানোর দুঃখ। সেই বিষণ্ন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবকে দেখে আমি বৈচির দুঃখ ভুলে যাই। মুহূর্তে বুঝতে পারি,

শেখ মুজিবের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হলে আমি বৈচিকে একেবারে ভুলে যেতে পারব।

কী করি, কী করি!

চলে আসি শহরে। তার পর শওকত কন্ট্রাকটরের ম্যানেজারি। সে সময় আর একবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার দেখা। আমি রিকশা করে কাজে যাচ্ছি, হঠাৎ সামনে বেজে উঠল সাইরেন। প্রথমে একটা ছাদ খোলা জিপ, তাতে আর্মড পুলিশ, তারপর কতগুলো মোটরসাইকেলের মাঝখানে শেখ মুজিবের গাড়ি। তিনি বসে ছিলেন জানালার ধারে। আমি রিকশায় বসে স্পষ্ট দেখি শেখ মুজিবুরের চেহারায় খানিকটা বিষণ্নতা। দেখে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, বঙ্গবন্ধু, তুমি কেমন আছ?

তার কয়েক দিন পর বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। সেই আমার দুঃখের শুরু। আমার সব গেল। বৈচি এবং বঙ্গবন্ধু দুজনেই। আমি কাপুরুষ, দুজনের একজনকেও ধরে রাখতে পারলাম না।

তারপর থেকে আমি গোপনে বঙ্গবন্ধুর একটা ছবি আমার মানিব্যাগের ভেতর রেখে দিই। রাতে ঘুমোনোর আগে একবার দেখি। ছবিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কাপুরুষ মনে হয়। বঙ্গবন্ধু, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়।

হঠাৎ খেয়াল হয়, এসব ভাবতে ভাবতে কাজের কথা ভুলে গেছি। আমি এসেছি সিমেন্ট নিতে। এনায়েত ট্রাক নিয়ে বসে আছে। রহিমকে পাঠিয়েছি সিগারেট আনতে। ইনডেন্ট আমার পকেটে। দুপুর হয়ে গেল, খিদে পেয়েছে। গেটপাস করিয়ে এনায়েতের হাতে দিয়ে চলে যাব।

আমি গোডাউনের দিকে হাঁটতে থাকি।

ফেরার পথে রিকশায় বসে আমার একবার রহিমের কথা মনে পড়ে। ত্রিশটা টাকা নিয়ে ভাগল! নিশ্চয় কোথাও জুয়া খেলতে বসে গেছে। পেয়ে নিই হারামজাদাকে।

কিন্তু স্যারকে হিসেব দেব কেমন করে! ঝামেলা হয়ে গেল। খানিক পর সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে দিই, যা হয় হবে। এখন ওসব ভেবে মন খারাপ করার মানে নেই। স্যারকে বলব, ত্রিশ টাকা আমি খরচা করেছি।

রিকশাটা তখন আউটফল থেকে বেরিয়ে রেললাইন পেরিয়েছে। হঠাৎ দেখি সামনে অনেক লোকজনের ভিড়। রিকশাওয়ালা বলল, কে একজন ট্রাক চাপা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ। শুনে বুকের ভেতরটা চিনচিন করে। নেমে একবার দেখে যাব। তখুনি শুনি ভিড়ের ভেতর মেয়েমানুষের কান্না। বুক চাপড়ে কাঁদছে কেউ। মনে পড়ে আমি বঙ্গবন্ধুর জন্য কখনো কাঁদিনি। আজ রাতে কাঁদব, মন ভরে কাঁদব। কাঁদলে অপরাধবোধ খানিকটা কমবে।

আমার রিকশা তখন দ্রুত ভিড় পেরিয়ে যাচ্ছে।

তিন

আশরাফ মিয়া বসেছিল বটতলায়। এখন রোদ হেলে গেছে বটগাছের পশ্চিমে। তলায় পড়েছে দীর্ঘ ছায়া। গাছে ছিল রাজ্যের কাক। সকাল থেকে টানা চিৎকার করছিল। এখন ক্লান্তিতে ঝিমাচ্ছে সব। চারদিকের পৃথিবী চুপচাপ হয়ে আসছে। এবার গরমটা পড়েছে খুব।

আশরাফ মিয়ার ঝিমুনি ধরছিল। এক জায়গায় তিন ঘণ্টা বসে। ঝিমুনি তো ধরবেই! তা ছাড়া আশরাফ মিয়া ওঠে খুব সকালে। প্রায় রাত থাকতে। অনেক দিনের অভ্যাস। ভোররাতে শুলেও ঘুম ভেঙে যাবে ঠিক আজানের সঙ্গে সঙ্গে। উঠে প্রস্রাব-পায়খানা, হাতমুখ ধোয়া, নাশতা করা। এসব করতে করতেও বেলা ওঠে না। তবু আশরাফ মিয়া বারান্দা থেকে ত্রিশ বছরের সাইকেলটা নিয়ে বেরোয়। বেরিয়ে কত জায়গায় যে যায়! কত রকমের কাজ থাকে মানুষটার। ম্যালা লোকজনের কাছে টাকা-পয়সা পাওনা, ম্যালা লোকজনকে আগাম টাকা দিতে হয়। আশরাফের পার্টিরা সবাই কন্ট্রাকটর। কিছু আছে দোকানদার, সিমেন্ট-রডের কারবারি। আবার কিছু আছে দালাল। আশরাফের কাছ থেকে মাল কিনে অল্প লাভে বিক্রি করে। এইসব লোকজনের কাছে সকাল থেকেই যাতায়াত শুরু হয় আশরাফের। পুরনো সাইকেলটা আস্তেধীরে, মাঝবয়েসি শরীরে টেনে টেনে লোকজনের কাছে যায়। দুধারের বুক পকেটে জ্যাম হয়ে থাকে টাকা। আশরাফের ভাগ্য বটে, যেখানে হাত দেয় সেখান থেকেই উঠে আসে কড়কড়া নোট।

আশরাফ এত টাকা দিয়ে কী করে?

সংসারে বউ ছাড়া আর কেউ নেই আশরাফের। বিয়ে করেছে পঁচিশ বছর, ছেলেপেলে হয়নি। বাপের কালের বস্তিবাড়ি শিংটোলায়। একটা ঘরে আশরাফ আর আশরাফের বউ। বাকি চৌদ্দ পনেরোটা ঘরে ভাড়াটে। সব রিকশাওয়ালা পান দোকানদার ওস্তাগার লেবার ধরনের মানুষ। মাসকাবারি পয়সা। ভাড়ার পয়সায়ই চলে যায় আশরাফের। তবু দালালিটা সে করে। ছেলেপেলে নেই, কার জন্য করে কে জানে!

সকাল থেকে আজ আশরাফের মনটা খারাপ হয়ে ছিল। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। ফরাশগঞ্জের এক পার্টিকে দিয়েছিল দশ হাজার টাকা। গতকাল মাল দেবার কথা। সারা দিন বসে থেকে লোকটার পাত্তা পাওয়া গেল না। শালা টাকা নিয়ে ভাগলো! বলা যায় না! দশ হাজার টাকার ব্যাপার। চিন্তায় রাতে ঘুম আসেনি। কারবারে নামা ইস্তক লোকসান করেনি আশরাফ। ভারি হিসাবি মানুষ। হিসাবি মানুষ না হলে এত টাকা-পয়সার মালিক হতে পারত না। বাপে তো টাকাপয়সা কিছু দিয়ে যায়নি। শিখিয়েছিল ওস্তাগারি। বউটার ছেলেপেলে হলো না। আশরাফের টাকা-পয়সার খরচা বাড়ল না। এ জন্য আশরাফের কী কোনো গোপন দুঃখ আছে!

প্রথম কিছুকাল ওস্তাগারি করেছে আশরাফ। বাড়িভাড়ার পয়সা তখন ছিল কম। তবু দুজন মানুষের সংসার চলে যেত ভালোই। এসবের ফাঁকে ফাঁকেও আশরাফ টাকা-পয়সা কিছু জমিয়ে ফেলল। তারপর শুরু করল দালালি। প্রথম কিছুদিন পার্টনার ছিল ফরাশগঞ্জের এক সিমেন্ট দোকানদার। লোকটা লাইন বুঝত। বছর দুয়েক করার পর আশরাফ নিজেও লাইনটা বুঝে গেল। পার্টনারশিপ দিল ছেড়ে।

সেই শুরু। দিনে দিনে পয়সা আসতে লাগল। লস নেই, ব্যবসায় লস নেই আশরাফের। টাকা লাগাতেই টাকা। কিন্তু এত টাকা দিয়ে আশরাফ কী করবে? তার কোনো পোলাপান নেই। খাবে কে? বউটা মরলে, আশরাফ মরলে সব তো কাক-চিলে খাবে!

তো আশরাফের ভেতরে ভেতরে একটা ইচ্ছা আছে। চারতলা একটা বাড়ি বানাবে। ওস্তাগারিটা তো জানেই। নিজেই করবে কাজটা। তারপর মরে যাবার আগে বউর গলা ধরে, ছেলেপেলের দুঃখে একদিন খুব কাঁদবে।

কিন্তু চারতলা বিল্ডিং তুলতে কত টাকা লাগে আশরাফ জানে না। আন্দাজ করে, আরো বছর পাঁচেক দালালিটা করতে হবে। কিন্তু পাঁচ বছর আশরাফ বাঁচবে তো? বুকের ভেতর সময়ে-অসময়ে আজকাল কেমন করে। রাতের বেলা ঘুম হয় না। সাইকেল চালিয়ে শিংটোলা থেকে ফরাশগঞ্জ যেতে ক্লান্তি লাগে। শুনেছে মরার আগে মানুষের এরকম হয়। তাহলে আশরাফ কি আর বেশিদিন বাঁচবে না? শেষ ইচ্ছাটা কী...

এইটুকু ভাবতে বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে। ফরাশগঞ্জের দোকানদারটার কথা মনে পড়ে। দশ হাজার টাকা আগাম দিয়েছে। মাল দেয়ার কথা ছিল কাল। দেয়নি। দিলে হাজার আড়াই টাকা লাভ। পার্টিও ঠিক করে রেখেছে আশরাফ। কিন্তু লোকটাকে পাওয়া যায়নি। হায় হায়, দশ হাজার টাকা না মেরে দেয় শালা।! তাহলে সময় যে আরো বেড়ে যাবে! পাঁচ বছরে কুলাবে না।

আজ একবার লোকটার কাছে যাবে আশরাফ। কাল রাতেই ভেবে রেখেছে। কিন্তু সকালে উঠেই মনে হয়েছে আজ মঙ্গলবার। মিউনিসিপ্যালিটির গোডাউন থেকে আজ সিমেন্ট সাপ্লাই দেবে। দুয়েকটা পার্টি ধরতে পারলে ভালো টাকার কাজ হবে। সকালবেলা তাই আশরাফ অন্য কাজে না গিয়ে এখানে চলে এসেছে। পার্টি অবশ্য একটা সকালবেলা এসেই জুটিয়েছে। আরিফ কন্ট্রাকটর। মাল পাবে চল্লিশ ব্যাগ, বিশটাই ছেড়ে দেবে। খরচাপাতি বাদ দিয়ে আশরাফের কাজ হবে টাকা পঞ্চাশেকের। তার ওপর রহিম বলেছে পার্টি ধরে দেবে। কিন্তু হারামজাদার পাত্তা নাই। তিন ঘণ্টা আগে গেছে ঠেলাগাড়ি আনতে। সঙ্গে নিয়ে গেছে আশরাফের সাইকেলটা। এত দেরি করছে কেন?

আরিফ সাহেবকে তিনটা ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রেখেছে আশরাফ। একটু আগে মানুষটা বিরক্ত হয়ে উঠে গেছে গোডাউনের দিকে। বিরক্ত হোক আর যা-ই হোক আশরাফ ছাড়া উপায় নেই। আছে চল্লিশ ব্যাগ সিমেন্টের ইনডেন্ট। ওই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেবে।

কিন্তু রহিমটা এতক্ষণ কী করছে? দুপুর শেষ হয়ে এল, ঠেলাগাড়ি আনতে এতক্ষণ লাগে! না, আশরাফের খুব লোকসান হয়ে যাচ্ছে।

গোডাউনের কাছে থাকলে এতক্ষণে আরো দু-একটা পার্টি ধরে ফেলতে পারত। আরো কিছু টাকা আসত।

কিন্তু রহিম না এলে এখান থেকে যায় কেমন করে? হারামির বাচ্চায় সাইকেলটা নিয়ে গেছে। বাপের আমলের সাইকেল, ত্রিশ বছর ধরে চলছে, দুটো পয়সা খরচ করতে হয়নি। হারামির বাচ্চায় সাইকেলটা নিয়ে ভাগল? ঠিক বেচে দিয়ে জুয়া খেলতে বসে যাবে, রাতের বেলা খাবে মাল। দশ দিন ওর আর পাত্তা পাওয়া যাবে না।

এই অব্দি ভেবে রাগে বুক জ্বলতে থাকে আশরাফের। মামদার পুতে হগল সাইডেই লস করাইলো। পাইয়া লই চুতমারানির পুতেরে।

মুখে ঘাম জবজব করছিল, সাদা ফুল হাতা জামার খুঁটে মুখটা ভালো করে মোছে আশরাফ। চায়ের দোকানের ছেলেটাকে বলে, রহিম আইলে বাইন্দা থুইবি হালারে। আর আরিফ সাবে আইলে কবি আমি ঠেলা আনতে গেছি। থাকতে কবি।

আশরাফ আর দাঁড়ায় না। আউটফলের রোদ আর ধূলিবালি ভেঙে হেঁটে যায়। রহিমের ওপর রাগে গড়গড় করছে ভেতরটা। এখন রিকশাভাড়া লাগবে। পারতে রিকশায় চড়ে না আশরাফ। নগদ পয়সা লাগে। হাঁটার অভ্যাস তো নেই। ত্রিশ বছর হাঁটেনি আশরাফ। সাইকেল চালিয়েছে। আজ এতটা দূর হাঁটতে আশরাফের পা টলমল করে। তবু হাঁটে আশরাফ। পয়সা লস করা যাবে না। লস করলে আশরাফের শেষ ইচ্ছাটা...

রেললাইনের কাছাকাছি এসে একটু ছায়া দেখে দাঁড়ায় আশরাফ। হাঁ করে শ্বাস টানে। বুকটা আইঢাই করছে। আশরাফ কি আর পাঁচ বছর বাঁচবে না! শেষ ইচ্ছাটা...

আশরাফ আবার হাঁটতে থাকে। দ্রুত সবকিছু করতে হবে আশরাফকে। পাঁচ বছর সময় নেয়া যাবে না। জীবনে ওই একটাই ইচ্ছা। ইচ্ছাটা পূরণ করতে হবে।

রেললাইনটা পেরিয়ে আসতেই, সামনে একদল লোক, সবাই হুতাশ করছে। দেখে আশরাফ একটু দাঁড়ায়। একজন লোক খুব দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছিল জায়গাটা। আশরাফ তার ডান হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে, কী হইছে ভাই?

লোকটা ব্যস্তভাবে বলল, অ্যাকসিডেন্ট। বলেই চলে গেল।

আশরাফ ভিড় ঠেলে ততক্ষণে লাশটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কে একজন কাঁদছিল, প্রথমে তার দিকে তাকায় পরে লাশের দিকে। তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা গলাকাটা মুরগির মতো লাফঝাঁপ শুরু করে। চোখ ফেরানোর আগে তার ত্রিশ বছরের পুরনো সাইকেলটার দিকে তাকায় আশরাফ। দুমড়ে মুচড়ে জিলিপি হয়ে গেছে সাইকেল। ইচ্ছা করে সাইকেলটার গায়ে একবার হাত বোলায়। তখুনি ভয়টা চেপে ধরে। কেউ যদি জেনে ফেলে রহিমকে আশরাফই পাঠিয়েছিল, সাইকেলটাও আশরাফেরই, আশরাফ তখন কী করবে?

ভিড় থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে একটা রিকশায় চড়ে। কোনো রকমে রিকশাওয়ালাকে বলে, শিংটোলা যাও। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। আশরাফের মনে হয় সে আর বাঁচবে না। পুলিশে ধরলে টাকা-পয়সা সব যাবে। জেল। জেলে গেলে পাঁচ দিনও বাঁচবে না সে। এসব ভেবে রিকশায় বসে কান্না পেতে থাকে আশরাফের। দুহাতে বুকপকেট দুটো চেপে রাখে সে। টাকা-পয়সা বড় প্রিয় আশরাফের। এই টাকাগুলো নিয়ে পাঁচ বছর বাঁচতে চায় আশরাফ। তার একটা শেষ ইচ্ছা আছে। ইচ্ছাটা আশরাফ পূরণ করবে।

চার

গোডাউন বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওভারসিয়ার সাহেবও এইমাত্র অফিসরুম বন্ধ করে চলে গেলেন। তার হিসাব মেলানোর ব্যাপার থাকে। কন্ট্রাকটররা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ খাতাপত্র লেখা শেষ করে এইমাত্র লাল হোন্ডা চালিয়ে চলে গেলেন।

আরিফের যাওয়া হয়নি। সে বসে আছে অফিসরুমটার সামনে, ঘাসের ওপর। এখন আউটফলে লোকজন নেই। চারদিক নিঝুম হয়ে আছে। বিকেল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দু-একজন পাহারাদার ছাড়া আউটফলে এখন আর কেউ নেই।

আরিফ বসে আছে আশরাফ মিয়ার জন্য। দিনটা মিস হয়ে গেল। কাল থেকে কাজ ধরার কথা। ওস্তাগার ঠিক করা আছে। কিন্তু পয়সা নেই হাতে।

ছোটখাটো কাজ করে আরিফ। তার ওপর দুটো বিল আটকানো। ছাড়াতে কিছু টাকা লাগবে। টাকা ম্যানেজ হচ্ছে না। তার ওপর আবার কাজ। কাল থেকে না ধরলে ওভারসিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রেগে যাবেন। রিপোর্ট যাবে এক্সিকিউটিভের কাছে। অসুবিধা হবে আরিফের। কোটেশনের ছোট ছোট কাজ তাও টাইমলি শেষ করতে পারে না। আগের দু-তিনটা কাজে টাইম এক্সটেনশন করাতে হয়েছে। ওভারসিয়ার সাব এবার আগেই বলে দিয়েছেন, আর্জেন্ট ওয়ার্ক। টাইম দেয়া যাবে না। যদিও কাজ শেষ করার ডেট চলে গেছে তিন দিন আগে। কিন্তু তার জন্য আরিফ কনস্ট্রাকশন দায়ী নয়। স্টকে সিমেন্ট ছিল না–এই কজ দেখিয়ে এক্সটেনশনের চিঠি দেয়া যাবে। তা হলেই বা। আজ সিমেন্ট দেয়া হচ্ছে ওভারসিয়ার সাহেব জানেন। ইনডেন্ট দিয়ে রেখেছেন অনেক দিন আগে। তা ছাড়া তাকে ইনফর্ম করা হয়েছে কাল থেকে কাজ ধরবে। আজ সকালেই আরিফ জানিয়ে এসেছে। কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল। রাজ্জাক বলেছিল শ পাঁচেক টাকার কাজ চালাবে। আজ সকালেই দেয়ার কথা। আরিফ সেই আশায় ছিল। রাজ্জাকের কাছ থেকে আগেও বেশ কয়েকবার টাকা-পয়সা নিয়েছে। কমিট করে রাজ্জাক ফেল করে না। কিন্তু এবার কেমন উলটপালট হয়ে গেল। রাজ্জাক মন খারাপ করে বলল, দোস্ত, পারলাম না।

এরপর আর কী কথা থাকে! আরিফ রিকশা নিয়ে আউটফল চলে এসেছে। পকেটে গোটা পনেরো টাকা আছে। ঠেলাগাড়ি ভাড়া দিয়ে সিমেন্টটা নিয়ে যে বাসায় রাখবে, উপায় নেই। আউটফলে আসতে আসতে রিকশায় বসে একটা প্ল্যান করেছে। আশরাফ মিয়ার কাছে বিশ ব্যাগ মাল বেচে দেবে। নগদ পয়সা দেবে আশরাফ মিয়া। পয়সা পেলে প্রবলেম সলভড। কাজটা কাল শুরু করা যাবে। অল্পকিছু পয়সা খরচা করে আগের বিল দুটো ছাড়ানো যাবে। অবশ্য আর একটা প্রবলেম হবে। কাজটায় লাভ হবে না। সিমেন্ট বাঁচানো যাবে না দু ব্যাগও। চল্লিশটাই লাগবে। কী আর করা যাবে, পরে বিশ বস্তা ব্ল্যাকে কিনে নেবে। আশরাফকে ধরলেই ম্যানেজ করে দেবে। পয়সা বেশি যাবে। যাক, কী করা!

সকালবেলা আউটফলে এসেই আশরাফকে পেয়েছে। চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। আরিফকেও খাওয়াল এক কাপ। তখন দোকানে আর

কেউ ছিল না। চা খেতে খেতে আরিফ কথাটা বলল। আশরাফের তো কারবারই এটা। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। দরদাম ঠিক করে মনে মনে বিশ ব্যাগের দাম বের করে আরিফ। এক হাজার আশি। আশি টাকার চল্লিশ টাকা যাবে ঠেলাগাড়ি ভাড়া। দু-পাঁচ টাকা পিয়নদের বকশিশ। পুরো এক হাজার টাকা হাতে রাখতে পারবে। ওই টাকায় কাজটা অর্ধাঅর্ধি শেষ করা যাবে। শুধু তো লেবার আর কেরিং চার্জ। এক ট্রাক ভিটি বালি কিনতে হবে। আর সব মালামাল তো অফিস থেকে সাপ্লাই দেবে।

সবকিছু ভেবে আরিফ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিল, বাকি বিশ ব্যাগ সিমেন্ট কেনার আগেই বিল দুটো পাওয়া যাবে। হাজার চব্বিশেক টাকা। তখন আর আরিফকে পায় কে! চার মাসের সংসার খরচা দিয়ে মনোযোগ দিয়ে কাজটা করা যাবে।

ঘাপলা বাধাল রহিম।

আশরাফ মিয়া রহিমকে পাঠাল ঠেলাগাড়ি আনতে। তাড়াতাড়ির জন্য সঙ্গে দিল নিজের সাইকেলটা আর শওকত কন্ট্রাকটরের ম্যানেজার দিল সিগারেট আনতে ত্রিশ টাকা। সব নিয়ে রহিম যে গেল আর ফিরল না। আড়াইটা পর্যন্ত ঠায় বসে রইল আশরাফ। আরিফ এর মধ্যে বার কয়েক বটতলা আর গোডাউন করল। রহিমের পাত্তা নেই।

রহিমের একটু চুরিচামারির অভ্যাস আছে আরিফ শুনেছে। কিন্তু আশরাফ মিয়ার সাইকেল আর শওকত কন্ট্রাকটরের ম্যানেজারের ত্রিশ টাকা নিয়ে ভেগে যাওয়ার সাহস পেল কই? ও কি মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করবে না?

তিনটার দিকে শওকত কন্ট্রাকটরেরা সব ট্রাক ভরে সিমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে আরিফ। আজকের দিনটাই খারাপ। সকালবেলাটাই শুরু হয়েছে খারাপ ভাবে।

আশরাফ গেল সাড়ে তিনটার দিকে। যাওয়ার সময় আরিফের সঙ্গে দেখা হয়নি। আরিফ তখন গোডাউনে। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবু বাইরের প্রচণ্ড রোদ ভেঙে বটতলায় যায় আরিফ। আশরাফ মিয়াকে বলে নিজেই না হয় যাবে ঠেলাগাড়ি আনতে। পাঁচটায় গোডাউন বন্ধ হবে। তার আগে মাল বের করতে না পারলে ঘাপলা।

কিন্তু বটতলায় গিয়ে আশরাফ মিয়াকে না পেয়ে মন আরো খারাপ হয়ে যায় আরিফের। খিদে পেয়েছে, পকেটে পয়সাও নেই। তা ছাড়া এখানে খাবেই বা কী! কিন্তু খিদে পেয়েছে, না খেলে চলবে কেন!

চায়ের দোকানে ঢুকে আরিফ দুটো পরোটা নেয় আর আট আনার ভাজি। খেতে শুরু করবে, তখুনি চায়ের দোকানের ছেলেটা বলল, আশরাফ ভাইয়ে আপনেরে বইতে কইছে। হেয় গেছে ঠেলা আনতে।

শুনে খুশি হয় আরিফ। মনোযোগ দিয়ে খেতে থাকে। আশরাফ মিয়া গেছে ঠেলা আনতে। আশরাফ মিয়া যখন গেছে শিওর ঠেলা নিয়ে ফিরবে। পাঁচটার আগে মাল খালাস করতে পারলেই হয়, গোডাউনের বাইরে রাখতে পারলেই হয়। পরে আস্তেধীরে ঠেলায় ভরে সন্ধ্যার মুখে মুখে আউটফল থেকে বের করে নিতে পারলেই হয়। সন্ধ্যা হয়ে গেলে পুলিশ ঝামেলা করবে।

কিন্তু পাঁচটা বেজে গেল আশরাফ মিয়াও আর ফিরল না। আরিফ চারটার দিকে এসে বসেছে এখানটায়। আস্তেধীরে সব কন্ট্রাকটর গেল, গোডাউন বন্ধ হলো, আধঘণ্টা হয়ে গেল ওভারসিয়ার সাহেবও চলে গেছেন। আরিফ বসে আছে, আশরাফ মিয়া ফিরবে সেই আশায়। এই লোকটা কথা দিয়ে মিস করে না। লোভী লোক। বিশ ব্যাগ মালের লোভ ছাড়তে পারবে না। শালা লাভ তো করবে এক শো টাকা। এটা কি মিস করবে?

কিন্তু কেউ ফেরে না। না রহিম না আশরাফ মিয়া। রহিম না হয় ত্রিশ টাকা আর সাইকেল নিয়ে ভেগেছে, আশরাফ মিয়া ভাগলো কেন?

আরিফ কিছুই বুঝতে পারে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আর কতক্ষণে বসে থাকবে?

আস্তেধীরে নিজের ওপর রেগে যেতে থাকে আরিফ। পকেটে একটা সিগারেট ছিল, স্টার। বের করে ধরাবে, তখন খেয়াল হয় ম্যাচ নেই। কাছেপিঠে লোকজনও নেই। রাগে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দেয় আরিফ। শালার জীবনটাই বোগাস। বাপ শালা মরে গিয়ে বারো-তেরো হাজার টাকা আর দশজনের সংসারটা চাপিয়ে দিয়ে গেল। আরিফের বিএ পাসটা হলো না। সংসারে ঘানি টানছে। একটা প্রেমিকা ছিল, তরী। বাপ মরে যাওয়ায়, বড় সংসার দেখে ওই শালীও ভাগলো। এখন কোন এক ডাক্তারের বউ। লিবিয়ায় আছে। আর আমি শালা এখানে ছিঁড়ছি...

চারদিকের ঘনায়মান অন্ধকার ভেঙে উঠে দাঁড়ায় আরিফ। তখনি টের পায় রাগে দুঃখে কান্না পাচ্ছে তার। এখন কোথায় যাবে আরিফ? বেগমগঞ্জের গুমটি বাসায়! দশজন মানুষের কিলবিলে সংসারে!

ওখানে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। আরিফ আবার বসে পড়ে। পকেট থেকে সিমেন্টের ইনডেন্ট বের করে। কুচি করে ছেঁড়ে কাগজটা। ছিঁড়ে হাওয়ায় অন্ধকারে ভাসিয়ে দেয়। কাগজগুলো উড়ে উড়ে পড়ে আরিফের চারপাশে। আরিফ খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর সেই ছেঁড়া কাগজগুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। গুমরে গুমরে কাঁদে। অন্ধকারে আরিফের কান্না কেউ দেখে না।

১৯৭৮

ছোছা কদম

চৌধুরীদের বারবাড়ির সামনে একটা বকুলগাছ।

সেই গাছের সঙ্গে গরুর দড়ি দিয়ে প্যাঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে কদমকে। রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা শরীরের রং কদমের অনেকটাই পুরনো গাছপালার দেহকাণ্ডের মতো। বকুলগাছের সঙ্গে প্যাঁচিয়ে বাঁধার ফলে গাছ আর কদম একাকার হয়ে গেছে। মাঝারি মানের গাছটি হঠাৎ করেই গেছে মোটা হয়ে।

কদমের আজ কী হয় দেখার জন্য বাড়ির লোকজনের সঙ্গে গ্রামের কিছু উৎসাহী লোকও জড় হয়েছে গাছতলায়। কদমের দশা দেখে তারা বেশ খুশি। ছোছাটা এবার আসল জায়গায় ধরা খেয়েছে। নিজাম চৌধুরী জাঁদরেল লোক। কোনো রকমের তেড়িবেড়ি বরদাশত করেন না।

বকুলগাছের অদূরে চৌধুরীদের কাছারিঘর। সেই ঘরে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে গুড়গুড়া হুঁকায় তামাক খাচ্ছেন নিজাম চৌধুরী। দুপুরের পর পর কদমকে ধরেই গ্রামের গণ্যমান্য দু-চারজনকে খবর দিয়েছিলেন। তারা কেউ কেউ এসেও পড়েছে। কাছারিঘরের চেয়ার-বেঞ্চে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। খানিক আগে একপ্রস্থ আদা চা দিয়ে গেছে বাড়ির পুরনো চাকর নবু। কদমকে ধরার কাজে আজ নবুর ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। ধরার পর গোয়ালঘরের বাতার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা দড়ি এনে বাঁধাছাদার কাজটাও সে-ই করেছে। ফলে নবুর শরীরে এখন অন্য ধরনের স্ফূর্তি। যেন বিশাল একখানা গৌরবের কাজ সে করে ফেলেছে। হাঁটাচলার ভঙ্গিটাই বদলে গেছে। বেশ একটা কেউকেটা ভাব নিয়ে উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে আছে এখন। মুখটা হাসি হাসি।

একসময় গম্ভীর গলায় নবুকে ডাকলেন নিজাম চৌধুরী। নবু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল নবু। জে।

মাস্টার সাবরে খবর দেচ নাই?

দিছি না? লগে লগেই তো দিছি!

তয় এখনো আসে নাই ক্যান?

হেইডা আমি কেমতে কমু! নামাজ পড়তে বইছিল। আমারে কইল, যা আমুনে।

এখনো আসল না, তার লেইগাই তো সালিশ বহাইতে দেরি হইতাছে!

আরেকবার যামু? ডাইকা লইয়ামু?

চায়ের কাপে ফুরুক করে শেষ চুমুক দিল দলিল মাতবর। তারপর ডান হাতে ঠোঁট মুছে বলল, কাম নাই যাওনের। আইলে আইব, নাইলে আমরাই বিচার কইরা ফালামু।

মন্নাফ হাওলাদার সিগ্রেট টানে মুঠো করে। বুড়ো আঙুলের পাশের দু আঙুলের ফাঁকে কায়দা করে সিগ্রেট আটকে, হাতটা মুঠো করে টানতে থাকে। ছোট্ট কলকে হাতের মুঠোয় ধরে গাঁজাখোররা যেভাবে গাঁজা টানে, ভঙ্গিটা অনেকটাই সে রকম। আর টানার সঙ্গে ফোওস্ ফোওস্ করে ভালো একটা শব্দ হয়। এখনো সেভাবেই সিগ্রেট টানছিল সে। শব্দের ফাঁকে বলল, রেজ্জেক মাস্টার বুড়া মানুষ। তারে ডাকনের কাম কী! এত ছোড বিচারে এত মানুষ লাগে না।

খলিল ভেন্ডার নিরীহ ধরনের মানুষ। নরম-শান্ত গলায় বলল, মাস্টার আমগো বেবাকতের মুরব্বি। গেরামের বিচার-সালিশ তারে ছাড়া হয় না। সে থাকলে ভালো হয়।

হুঁকার নল নবুর হাতে দিয়ে নিজাম চৌধুরী বললেন, সেইটা আমিও বুজি। এর লেইগা তারেঐ বেবাকতের আগে খবর দিছি। অহনতরি আইল না। তয় আমরা একটা কাম করি, সালিশটা শুরু কইরা দেই। মাস্টার যুদি আহে তো আইল, না আইলে নাই। কদমার ভালো একখান বিচার আইজ হওন উচিত। বহুত দিন ধইরা গেরামডারে ও জ্বালাইয়া খাইতাছে।

ওহাব আলী পঞ্চায়েত বলল, কারেক্ট। ছেমড়াডা বড় ফাজিল। ইংরাজিতে যাকে বলে...

কিন্তু ইংরেজি শব্দটা খুঁজে পেল না সে। থেমে গেল।

নিজাম চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। তয় লন। শুরু করি।

তাঁর দেখাদেখি বাকি চারজনও দাঁড়াল।

নবুর দিকে তাকিয়ে নিজাম চৌধুরী বললেন, এই ঘরের চের-বেনচি সব বাইরে নে। বহনের বেবস্তা কর।

হুঁকা রেখে প্রথমেই নিজাম চৌধুরীর চেয়ারটা বকুলতলায় নিয়ে রাখল নবু। তারপর চটপটে হাতে লম্বা বেঞ্চটা নিল, বাকি চেয়ারগুলো নিল। যে যার জায়গামতো বসে পড়ল।

তখন বকুলতলায় লোকজন আরো বেড়েছে। বাড়ির বউঝিরাও ঘর-দুয়ারের আনাচে-কানাচে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথার ঘোমটা দাঁতে কামড়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। কী বিচার ছোছাটার আজ হয়, দেখতে চাইছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে নির্বিকার। যেন গরুর দড়ি দিয়ে বকুলগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা কোনো ব্যাপারই না। লোকজন, বিচার-সালিশ কোনো ব্যাপারই না। খানিক আগে ছোট মেন্দাবাড়ির তোতা তার পেটে আঙুল দিয়ে বেশ একটা খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে কদমা, সমবাত কী?

ওই অবস্থায়ই বাইনমাছের মতো দুখানা মোচড় দিয়ে হেসে কুটিপাটি কদম। এমুন কইরেন না দাদা। ক্যাতকুতি লাগে।

কদমের শরীরে সুড়সুড়িটা বেশি। বগলের তলায়, কোকসার কাছে, তলপেটে কেউ হাত ছোঁয়ানো তো দূরের কথা, আঙুল তুলে ছোঁয়াবার ভঙ্গি করলেই মোচড়াতে থাকে কদম আর খি খি করে হাসতে থাকে। অদৃশ্য এক কাতুকুতিতে আক্রান্ত হয়। বকুলগাছের সঙ্গে নবু যখন তাকে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে বাঁধছিল, তখন বগল কোকসা সব জায়গাতেই সুড়সুড়ি লাগছিল। ধরা পড়ার কথা ভুলে হেসে কুটিপাটি হচ্ছিল কদম। নবুকে সে ডাকে নবু দাদা, হাসতে হাসতে মোচড়াতে মোচড়াতে বলছিল, অ্যাই নবু দাদা অ্যাই, ক্যাতকুতি লাগে তো!

নবু গ্রাহ্য করেনি। বলেছিল, ক্যাতকুতি তোমার আইজ ছুইট্টা যাইব শালার পো শালা। কার বাইত্তে ধরা পড়ছ, উদিস পাইবা নে!

তারপর আস্তে আস্তে যখন লোকজন জুটতে শুরু করল, গ্রামের ত্যাদর পোলাপানগুলো ঘিরে ধরল কদমকে, তখন ভালো একটা আজাব শুরু

হলো। যে সে আঙুল তুলে কাতুকুতু দিতে আসে, আচমকা খোঁচা দিয়ে ছুটে যায় কেউ। বড় মেন্দাবাড়ির টিপু একটা চোতরাপাতা ঘষে দিয়ে গেল পেটের কাছে। তারপর থেকে চুলকাতে চুলকাতে জায়গাটা এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। তবে টিপুকে কদম ছাড়েনি। এক হাতে পাগলের মতো পেট চুলকাতে চুলকাতে তুবড়ির মতো শুরু করেছিল বকাবাজ্যি। যত রকমের বকা জানা ছিল সবই টিপুর ওপর ঝেড়েছে। তারপর চুলকানি বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মুখও বন্ধ করেছে। এখন নির্বিকার, চুপচাপ। ফ্যালফ্যাল করে নিজাম চৌধুরী গংদের দেখছে।

নিজাম চৌধুরী জলদগম্ভীর গলায় বললেন, হাজেরানে মজলিস, কদমারে আপনেরা বেবাকতেই চিনেন। অর কীর্তিকলাপও জানেন। গেরামডারে ও জ্বালাইয়া খাইল। জুয়ানমর্দ মানুষ কোনো কাম-কাইজ করব না, কোনো বাড়িতে রাখতে চাইলে থাকব না, খাইব চুরি কইরা। না না, জিনিসপত্র, সোনাদানা, কাপড়চোপড়, থালাবাসন, হাঁড়িপাতিল, মোটকথা কোনো জিনিসই কদমা চুরি করে না। তয় কী চুরি করে? করে খাওন। ভাত, খালি ভাত চুরি করে।

কাজিবাড়ির আকবর বলল, না না, খালি ভাত চুরি করব ক্যান? মুড়িমিডাই চুরি করে, পিডা চুরি করে। গাছের আম-ডাব গয়া পাকাগাব বেবাক চুরি করে। আমগো বাইত্তে একদিন...

বলেই টের পেল নিজাম চৌধুরীর কথার মাঝখানে কথা বলা তার ঠিক হয়নি। নিজাম চৌধুরী যখন কথা বলেন তখন গ্রামের কেউ রা করে না। আজ কদমাকে ধরা পড়তে দেখে উত্তেজনায় ভুলটা আকবর করে ফেলেছে। আল্লাই জানে কদমাকে ছেড়ে আকবরকে নিয়েই সবাই পড়ে কি না এখন!

ওহাব আলী পঞ্চায়েত তখন কটমটে চোখে আকবরের দিকে তাকিয়েছে। তুই তো বড় লনছেন (ননসেন্স)। চদরি সাবের মুখের উপরে কথা কচ!

দলিল মাতবর বলল, আইজকাইলকার পোলাপান মহা বেদ্দপ। আদব-লেহাজ কিচ্ছু নাই।

খলিল ভেন্ডার মিনমিন করে বলল, কাজিবাড়ির পোলা এমুন হইল কেমতে? ময়মুরব্বি মানে না!

রেগে গেলে তোতলাতে থাকে মন্নাফ হাওলাদার। চোখ দুটো বড় হয়ে যায়, আর মুখের কথা যায় আটকে। এখনো তা-ই হলো। তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, এ এ এই না না নালায়েক, তু তুই এ এহেন থিকা যা।

কিন্তু নিজাম চৌধুরী আকবরকে ক্ষমা করলেন। হাসিমুখে বললেন, থাউক, পোলাপান মানুষ বুইজ্জা সারতে পারে নাই। ক আকবর ক, তগো বাইত্তে কী করছিল চোরায়?

আকবর কথা বলবার আগেই খি খি করে হাসল কদম। ও কইব কী, আমিঐ কই, হুনেন। আইজকার এমুন টাইমে বইয়া অর মায় একদিন চিতইপিডা ভাজতাছিল। হেদিন আমি কোনহানে খাওন পাই নাই। বেপারি বাড়িত গিয়া বহুত নিয়ারা করছি, একমুঠ ভাত দেয় নাই। আইছি কাজিবাড়ি। আম্মারে পিডা ভাজতে দেইখা কইলাম, দুইহান পিডা দেন আম্মা, বহুত খিদা লাগছে। আম্মায় এমুন ধুর ধুর কইরা উটল! চুলার ছাইদারা দিয়া পিডাইতে আহে আমারে। আমি দৌড়াইয়া পলাইয়া গেলাম।

বলেই আবার খি খি করে হাসে কদম। আসলে কইলাম গেলাম না। রান্ধন ঘরের পিছে গিয়া বইয়া রইলাম। আম্মায় বুড়া মানুষ। চোক্কে দেখে কম। পিডা ভাইজ্জা কুলায় রাখে, পিছে থিকা হাত দিয়া আমি লইয়া যাই। এমতে কইরা গইন্না গইন্না পাঁচখান পিডা খাইলাম। প্যাট আল্লার রহমতে টাইট হইয়া গেল। তহন আম্মায় দেহে পিডা ভাইজ্জা কুলায় রাখে, পিডা যায় কই! আম্মায় তো কারবারডা বুইজ্জা গেল। তারবাদে আথকা এমুন চিইক্কার দিল, আকবইরা, ওই আকবইরা, এই মিহি আয়। চোরায় তো আমার বেবাক পিডা খাইয়া হালাইল! আকবইরা ঘর থিকা দৌড়াইয়া বাইর হওনের আগেই আমি পলাইয়া গেছি গা। হি হি হি।

কদমের হাসি দেখে পোলাপান আর বাড়ির বউঝিদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়। দেখে নিজাম চৌধুরী জোরে একখানা ধমক দেন। খামোশ।

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপচাপ।

নিজাম চৌধুরী বললেন, চোরার কথা শুইনা হাসনের কিছু নাই। আর কার কী কওনের আছে কন আপনেরা। বেবাক হুইন্না তারবাদে অর বিচার করুম।

দলিল মাতবর বলল, মাইনষের কথা কী হুনবেন, আমারডা হুনেন। আমার খ্যাতের বাঙ্গি তরমুজ তো বেবাক ওই চোরার পেডেঐ যায়।

মন্নাফ হাওলাদার বলল, বাড়ির ডাব-নাইরকল, ব্যাল কিচ্ছু অর লেইগা রাখতে পারি না।

ওহাব আলী পঞ্চায়েত বলল, আমার ছাড়াবাড়ির আম-জাম আর বরুই অর্ধেক খায় ও একলা।

খলিল ভেন্ডার বলল, আমার রান্ধনঘর থিকা পাতিল ধইরা ভাত লইয়া গেছে, নুন সালুন বেবাক লইয়া গেছে। এক দিন না, বহুত দিন।

মকবুলের নানির গাছের পেয়ারা, বেগমের মায়ের গাছের কতবেল, আজাদের খালার ঝাঁকা থেকে শসা, আমিনুলদের বাড়ির নামার দিককার খেতের আখ, মিয়াবাড়ির জামরুল সবই যে চুরি করে খায় কদম, জানা গেল। কোনো বাড়ির মুড়ি-চিড়া, কোনো বাড়ির গরুর দুধ, নাড়ুমোয়া, মোটকথা খাওয়া যায় এমন সবকিছুই নিয়মিত চুরি করছে কদম। তার যন্ত্রণায় গ্রামের লোক অতিষ্ঠ।

সব শুনে নবুর দিকে তাকালেন নিজাম চৌধুরী। এইবার আইজকার ঘটনাটা ক। আমার বাড়িতে কী চুরি কইরা ধরাডা ও পড়ছে। আর কেমতে অরে তুই ধরলি।

কদম বলল, নবু দাদার কওনের কাম কী? আমিঐ কই।

নবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না না, আমি কমু। আমগো বাড়িতে আইজ দোফরে খিচড়ি আর ইলশা মাছ ভাজা হইছে। রান্ধনঘরে বইয়াই খাইছে বেবাকতে। বাকি রইছে খালি আম্মায়। বাড়ির বেবাকতেরে খাওয়াইয়া হেয় খায়, এইডা নিয়ম।

নিজাম চৌধুরী ধমক দিয়ে বললেন, এত প্যাচাইলের কাম নাই। আসল কথা ক।

কদমা বলল, আসল কথাডা আমি কই। বড় একখান থালে খিচড়ি আর দুই টুকরা একছেইয়া ইলশা মাছ ভাজা খালি লইছে আম্মায়, আথকা আমি রান্ধনঘরে ঢুইক্কা হেই থাল লইয়া দৌড় দিছি। বাঁশঝাড়তলে গিয়া হাউশ মিটাইয়া খাইছি। শেষ লোকমাডা মোখে দেওনের লগে লগে নবুদাদায় গিয়া আমারে ধইরা ফালাইছে। কেস ঢিসমিস। হি হি হি।

নিজাম চৌধুরী অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হুনলেন তো আপনেরা! চোরা নিজ মুখেই স্বীকার করল বেবাক কথা।

খলিল ভেন্ডার মিনমিনে গলায় বলল, কদমার একটা ভালো স্বভাব হইল, ও কোনো সময় মিছা কথা কয় না। যা করে হেইডা কইয়া ফালায়।

দলিল মাতবর বলল, ভালো বংশের পোলা তো! অর বাপদাদারা নামকরা মানুষ আছিল। রক্তের গুণডা আছে। তয় স্বভাবটা যে ছেমড়ার ক্যান এমুন হইল?

মন্নাফ হাওলাদার বলল, অভাব, অভাবে পইড়া হইছে। মা-বাপের এক পোলা। কদমার জন্মের কিছুদিন পর থিকাই অসুখে পড়ল অর বাপে। জাগাজমিন বেইচ্চা খাইচে অর চিকিস্যা করাইছে। মরণের সময় পথের ফকির। বাড়ির ভিটা গেছে, ঘর গেছে। কদমার লেইগা রাইখা যায় নাই কিছুই। শ্যাষ জীবনে কদমার মায় তো ভিক্কা কইরা খাইত।

ওহাব আলী পঞ্চায়েত বলল, হ, কদমার বাপের পেরালাইস (প্যারালাইসিস) হইছিল। পেরালাইসে আঁতুড়ে হইয়া গেছিল।

নিজাম চৌধুরী বলল, বেবাকঐ বুজলাম। তয় কদমা জুয়ানমর্দ পোলা, ও ক্যান কাম কইরা খায় না?

শুনে কদম বলল, আমার কাম করতে ভাল্লাগে না।

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন নিজাম চৌধুরী। খামোশ বুরবক কাহিকা!

তারপর দলিল মাতবরের দিকে তাকালেন। কন মিয়ারা, কী বিচার হইব?

দলিল মাতবর বলল, বিচারডা আমি ভাবছি। অরে গেরাম থিকা বাইর কইরা দেন। এই গেরামে ও থাকতে পারব না।

কদম বিস্মিত গলায় বলল, তয় আমি থাকুম কই? এইডা আমার গেরাম। বাড়িঘর কিচ্ছু নাই, তাও তো গেরামডা আমার। আমি এই গেরাম ছাইড়া যামু না।

মন্নাফ হাওলাদার বলল, তর ঘাড়ে যাইব।

খলিল ভেন্ডার বলল, কদমা থাকে কোন বাইত্তে?

অন্য কেউ কথা বলার আগেই কদম বলল, কোনো বাইত্তে থাকি না। এহেক দিন এহেক বাড়ির গোয়াইলঘরে, নাইলে রান্ধনঘরে, নাইলে নাড়ার পাল্লায় থাকি। খরালিকালে কোনো অসুবিধা নাই, শীতের দিনে শীতে বড় কষ্ট পাই। গেল শীতে মাস্টার সাবে একখান কম্বল দিছিল। মাঝখান দিয়া ভোগলা।

কদমের কথাবার্তা শুনে হাসি পাচ্ছিল অনেকেরই, কিন্তু নিজাম চৌধুরীর ভয়ে শব্দ করে হাসতে পারছিল না। মুখ টিপে, মুখ লুকিয়ে হাসছিল অনেকেই। বাড়ির বউঝিরা নিঃশব্দ হাসিতে এ ওর উপর ঢলে পড়ছিল।

নিজাম চৌধুরী আবার দলিল মাতবরের দিকে তাকালেন। তয় এইডাঐ আপনেগো বিচার?

দলিল মাতবর আমতা গলায় বলল, আপনে যুদি অন্য বিচার করতে চান করেন। আমগো কোনো আপিত্তি নাই। কী কন মিয়ারা?

বাকি তিনজন প্রায় একসঙ্গে বলল, হ।

নিজাম চৌধুরী বললেন, কদমার যা স্বভাব, গেরাম থিকা বাইর কইরা দিলেও হেই স্বভাব যাইব না। ডাকের কথা আছে না, 'জাইত যায় না ধুইলে, স্বভাব যায় না মরলে।' ও যেহেনে যাইব এই রকম চুরি কইরাঐ খাইব। অহন আমগো জ্বালাইতাছে, তহন অন্য মানুষরে জ্বালাইব।

মন্নাফ হাওলাদার বলল, হেইডা জ্বালাউক গিয়া। আমগো কী?

না হাওলাদার সাব, এই কথাডা ঠিক কইলেন না। দেশটা তো আমগো। দেশের মানুষও আমগো মানুষ। আমারে জ্বালান আর দেশের যে-কোনো মানুষরে জ্বালান এক কথা। এইডা আমি মনে করি। যুদ্ধ কইরা দেশটা আমরা স্বাধীন করছি শান্তিতে থাকনের লেইগা। হেইডা খালি একজনের শান্তি না, দেশের বেবাক মানুষের শান্তি। দেশের কোনো মানুষের শান্তি ও নষ্ট করতে পারব না।

ওহাব আলী পঞ্চায়েত বিপুল উৎসাহে বলল, কারেক্ট।

নিজাম চৌধুরী আগের মতোই বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললেন, যুদি এমুন হইত যে কদমা জীবনে কোনো দিন চুরি কইরা খায় নাই, আইজঐ পয়লা আমার বাড়িতে করছে, আমি অরে কিছু কইতাম না। মনে করতাম, পেডের দায়ে খাইছে। অরে আমি মাপ কইরা দিতাম। ও তো তা না।

খলিল ভেন্ডার তার স্বভাবসুলভ নিরীহ গলায় বলল, তয় আপনের বিচারডা কী, হেইডা কন? চোরারে আপনে জেলে দিতে চান?

কদম সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ, জেলে দেন আমারে। জেলে আমি আরামে থাকুম। খাওনের কোনো অসুবিধা হইব না। শীতের দিনে মোডা মোডা কম্বল দিব।

কঠিন চোখে কদমের দিকে তাকালেন নিজাম চৌধুরী। না, অত আরামে তরে আমি থাকতে দিমু না। ছোট্ট একখান শাস্তি দিয়া তরে আমি ছাইড়া দিমু। তয় হেই শাস্তির কথা তুই হারা জীবন মনে রাখবি। দেশের যেহেনেই থাকচ, না খাইয়া মইরা গেলেও চুরি কইরা খাইতে চাবি না। মানুষরে জ্বালাবি না।

শুনে লোকজনের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। এ ওর দিকে তাকাতে লাগল, ফিসফাস করতে লাগল। কী শাস্তি, এ্যাঁ!

কথাডা দলিল মাতবর বলেই ফেললেন। শাস্তিডা কী?

অর জিবলাটা এককড়া পরিমাণ আমি কাইটা ফালামু।

আচমকা এমন শাস্তির কথা বলবেন নিজাম চৌধুরী কেউ কল্পনাও করেনি। কেমন বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সবাই। এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কী, জিভ কেটে ফেলবে! বলে কী?

কেউ কেউ বলল, হ, ভালো শাস্তি। জিবলা কাইটা দিলে ইহজিন্দেগিতে আর চুরি কইরা খাওনের সাধ হইব না।

কিন্তু শাস্তির কথাটা কদম পাত্তাই দিল না। ভাবল চৌধুরী সাহেব তার সঙ্গে মশকরা করছেন। ঠোঁট উল্টে মজাদার একটা মুখভঙ্গি করল। ইহ্, জিবলা কাইটা দিব! 'চাচায় কইছে খালাত ভাই, আল্লাদের আর সীমা নাই।'

কদমের কথা শুনে এখন আর কেউ হাসছে না। কেমন একটা থমথমে পরিবেশ চারদিকে। ব্যাপারটা খেয়াল করে নিজাম চৌধুরী বললেন, কী মিয়ারা, রাও করেন না ক্যান? কন কেমুন শাস্তি? বিচারডা আপনেরা মানলেন কি না! তয় এইডা ছাড়া আর কইলাম কোনো শাস্তি অরে দিমু না। জিবলা কাটনের পর ও গেরামেই থাকব। তয় খাইতে হইব কাম-কাইজ কইরা।

তার পরও কেউ কোনো কথা বলল না। মন্নাফ হাওলাদার একটা সিগ্রেট ধরিয়ে মুঠো করে টানতে লাগল। দেখে নিজাম চৌধুরীরও তামাকের নেশা পেল। নবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তামুক আন।

নবু উৎসাহী গলায় বলল, লগে কি একখান বেলেডও লইয়ামু? বেলেড দিয়া জিবলা কাটতে সুবিধা হইব। ধরবেন আর ঘ্যাচ।

না, অর জিবলা আমি বেলেড দিয়া কাডুম না। কাডুম কাঁচি দিয়া। এক হাতে জিবলাডা টান দিয়া ধরুম, আরেক হাতে পোচাইয়া পোচাইয়া কাডুম। তামুকের লগে ধার দেইখা একখান কাঁচি আনবি।

এবার কদম বুঝে গেল সত্যি তার জিভ কাটা হবে। দিশেহারা অসহায় চোখে দলিল মাতবর গংদের দিকে তাকাতে লাগল। হায় হায়! জিবলা কাইটা দিলে আমি খামু কেমতে! কথা কমু কেমতে! ও মিয়ারা, আপনেরা দিহি কিছু কন না? হায় হায়! আমারে মাপ কইরা দেন। ছাইড়া দেন আমারে। আমি আর কোনো দিন চুরি কইরা খামু না। আমি এই গেরাম থিকা যামু গা। আমার জিবলাটা আপনেরা কাইটেন না।

কদম হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। চদরি সাব, ও চদরি সাব। আমারে আপনে মাপ কইরা দেন। আমার জিবলাটা আপনে কাইটেন না। চদরি সাব, ও চদরি সাব... ...

এ সময় সৌম শান্ত রাজ্জাক মাস্টারকে দেখা গেল চৌধুরীবাড়ির দিকে হেঁটে আসছেন। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, হাতে একখানা ছাতা। তিনি যখন কদমের অদূরে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন নিজাম চৌধুরীর গুড়গুড়া হুঁকা আর একখানা কাস্তে নিয়ে নবুও হাজির। হুঁকার নল চৌধুরী সাহেবের হাতে দিয়ে কাস্তে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিকালবেলার রোদের একটা রেখা এসে পড়েছে কাস্তের ধারের ওপর। ঝকঝক করছে কাস্তে।

রাজ্জাক মাস্টারকে দেখে আগের মতোই কাঁদতে কাঁদতে কদম বলল, ছার, ও ছার, আপনে আমারে বাঁচান ছার, আপনে আমারে বাঁচান।

রাজ্জাক মাস্টারকে দেখেই খলিল ভেন্ডার তার চেয়ার ছেড়ে দিয়েছে। সেই চেয়ারে বসে শাস্তির কথাটা শুনলেন রাজ্জাক মাস্টার। শুনে প্রথমে স্তব্ধ হলেন, তারপর চশমা খুলে পাঞ্জাবির খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন, লঘু পাপে গুরুদণ্ড।

নিজাম চৌধুরী তামাক টানতে টানতে রুক্ষ গলায় বললেন, না, গুরুদণ্ড না, এইটাই আসল দণ্ড। এইটাই হওন উচিত।

রাজ্জাক মাস্টারকে দেখে দলিল মাতবর গংদের মুখে কথা ফুটি ফুটি করছে। আমতা গলায় সে বলল, জিবলাটা না কাইটা অরে আপনে গেরাম থিকা বাইরঐ কইরা দেন।

ওহাব আলী পঞ্চায়েত সব সময়ই নিজাম চৌধুরীর পক্ষে। সে বলল, তয় চদরি সাবের ওই লেচকারটার (লেকচার) দাম রইল কী? দ্যাশের মানুষ, শান্তি, স্বাধীনতা!

ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না রাজ্জাক মাস্টার। নিজাম চৌধুরীর মুখের দিকে তাকালেন। কথাগুলো আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন চৌধুরী সাহেব।

সেই কথাগুলো আবার বললেন নিজাম চৌধুরী। শুনে খানিক চুপ করে রইলেন রাজ্জাক মাস্টার। তারপর ধীর-শান্ত গলায় বললেন, খুব সুন্দর কথা। আসলেই দেশের সব মানুষ আমাদের মানুষ। সব গ্রামই আমাদের গ্রাম। আমরা চাই সব মানুষই শান্তিতে থাক। এজন্যই আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। কদমের জন্য সেই শান্তি কেন নষ্ট হবে? কিন্তু এর পাশাপাশি আর একটা কথা আছে। বায়ান্ন সালে আমাদের ভাষাটা কেড়ে নিতে চেয়েছিল পাকিস্তানিরা। বুকের রক্ত দিয়ে আমরা তা ঠেকিয়েছি। প্রকৃত অর্থে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তর সালে সেই যুদ্ধে আমরা জয়ী হলাম। আর আজ স্বাধীন বাংলাদেশে সামান্য ভাত চুরি করে খাওয়ার অপরাধে, বাঙালি হয়ে একজন বাঙালির মুখের ভাষা আমরা কেড়ে নেব? এটা বড় অন্যায় হবে চৌধুরী সাহেব। কদমের দোষটা আমরা জানি। কেন সে এমন করে তাও জানি। কিন্তু তার দোষটা শুধরাবার চেষ্টা তো আমরা কেউ কখনো করিনি! কদমও তো দেশের মানুষ, তার কথা আমরা কেন ভাবিনি?

রাজ্জাক মাস্টারের কথা শুনে সবাই কেমন চিন্তিত হলো। তাই তো! এভাবে তো ভাবা হয়নি!

রাজ্জাক মাস্টার বললেন, আমি গরিব স্কুল মাস্টার। অতিকষ্টে দিনাতিপাত করি। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তার পরও আজ থেকে কদমের দায়িত্ব আমার। ও খাবে আমার বাড়িতে, থাকবে আমার বাড়িতে। এত দিন যে অন্যায় সে করেছে, তার হয়ে আমি আপনাদের কাছে সেই অন্যায়ের জন্য মাফ চাইছি।

হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন রাজ্জাক মাস্টার। কদমকে আপনারা মাফ করে দিন।

ঘরদুয়ারের আনাচকানাচে দাঁড়িয়ে থাকা বউঝিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, মা-বোনরা, আপনারাও কদমকে মাফ করে দিন।

রাজ্জাক মাস্টারের কথায় সবাই আপ্লুত হয়ে গেল। যে যার মতো করে বলতে লাগল, হ, আমরা অরে মাপ কইরা দিলাম। একদম মাপ কইরা দিলাম।

নিজাম চৌধুরী গম্ভীর গলায় বললেন, নবু, কদমারে ছাইড়া দে।

কদমা তখন আনন্দে আত্মহারা। ছেড়ে দেয়ার পর কোনো দিকে তাকাল না সে। আচমকা একটা দৌড় দিল, মাঠের দিকে নেমে গেল।

সূর্য ডোবার আগে রক্তের মতো লাল হয়েছে আকাশ। গ্রামের ধারে খোলা আকাশের তলায় নির্জনে পড়ে আছে সবুজ ঘাসের উদাস একখানা মাঠ। সেই মাঠের ওপর দিয়ে আনন্দে ফেটে পড়া শিশুর ভঙ্গিমায় ছুটছে কদম। যেন তার মতো স্বাধীন মানুষ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

২০০১

রতনপুরের সূর্যমুখী

জায়গাটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

হুবহু আমার নাটকের পটভূমি। যেন এই জায়গা ঘুরে গিয়েই নাটকের গল্প সাজিয়েছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! এ কী করে সম্ভব!

সঙ্গের লোকজন কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে জায়গাটি দেখি। বিশাল মাঠের ধারে গাছপালা ঘেরা গ্রামের বড়লোক বাড়ি। বাড়িতে চৌচালা টিনের চারখানা ঘর। মাঝখানে সাদা মাটির নিকোনো উঠোন। উঠোনের কোণে ধানের গোলা, পায়রার খোপ। দূর থেকেই পায়রাদের বাকবাকুম শব্দ পাচ্ছিলাম।

মাঠের পাশ থেকে বাড়ির কাছারি ঘরের দিকে চলে গেছে সরু একখানা পথ। পথের দুই ধারে গাছপালা ঘেরা বাগান। নানা রকমের ফুল ফুটে আছে বাগানে।

অদূরে মাঠের কোণে তিন-চারটি খড়ের গাদা। খড়ের গাদা ছাড়িয়ে গ্রাম জনপদের মতো করে সাজানো কয়েকটি দোকানপাট। একটি চায়ের দোকানও আছে।

এসবের ঠিক উল্টোদিক, মাঠের শেষে বাঁধানো ঘাটলার চমৎকার পুকুর। পুকুরধারে নানা রকমের গাছপালা, ফুল পাতাবাহারের ঝাড়।

পুকুরের পশ্চিমে মধ্যবিত্ত গ্রামগৃহস্থের বাড়ি। বাঁশের বেড়ার ঘর, গোয়াল। বাড়িতে ঢোকার মুখে ছোট্ট বাংলাঘর। ঘরের চালা ছেয়ে আছে মাধবীলতায়। অতি শান্ত স্নিগ্ধ, মনোরম পরিবেশ।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর মনে মনে শুটিংয়ের প্ল্যান করি। বড়লোকের বাড়িটি হবে শমী কায়সারদের। অর্থাৎ তালুকদারবাড়ি। পুকুরের

পশ্চিমের মধ্যবিত্ত বাড়িটি হবে তৌকীরদের। কে কোথা দিয়ে হেঁটে আসবে, কোথায় মিট করবে, মনে মনে ঠিক করি।

চম্পাদের বাড়ি হবে কোনটি?

চম্পার চরিত্রে অভিনয় করবে শাম্মি নামের একটি মেয়ে। দেখতে মোটামুটি ভালো। অভিনয় কেমন করে জানি না। আগে দু-একটি নাটকে অভিনয় করেছে। আমি দেখিনি।

চম্পা চরিত্রে প্রথমে যে মেয়েটির অভিনয় করার কথা ছিল, সে করল না। আগে থেকেই ভেবেছিলাম এই চরিত্রে একটি নতুন মেয়ে নেব। ডিরেক্টর ও ক্যামেরাম্যানকে বলায় তাঁরা দুজনেই একটি মেয়ের কথা বললেন। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তাকে খবর দিল। খালা ও ছোট বোনকে নিয়ে মেয়েটি এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাকে আমার পছন্দ হলো না। পছন্দ হলো ছোট মেয়েটিকে। আমার চম্পা চরিত্রের সঙ্গে মেয়েটির বেশ মিল।

এ কথা বলি কী করে? তা ছাড়া বড় মেয়েটি তৈরি হয়ে এসেছে।

মন খারাপ করে তাকে স্ক্রিপ্ট পড়তে দিলাম। মনিরা না কী যেন নাম। বেশকিছু টিভি নাটকে নাকি অভিনয়ও করেছে। কিন্তু তার স্ক্রিপ্ট পড়া দেখে আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম। সাধারণ পড়াটিই ঠিকমতো পড়তে পারছে না। এই মেয়ে অভিনয় করবে কী!

কিছু না ভেবেই ছোট মেয়েটিকে দিলাম স্ক্রিপ্ট পড়তে। আশ্চর্য ব্যাপার! স্ক্রিপ্ট সে শুধু পড়লই না, চমৎকার অভিনয়ও করে গেল।

আমি মুগ্ধ।

বড় মেয়েটি ও তার খালাকে বললাম, ওকে নিতে চাই।

শুনে দুজনেরই মুখ কালো হয়ে গেল।

কিন্তু ছোট মেয়েটি খুব উৎসাহী। সে রাজি।

খালা বলল, কাল আপনাকে ফোনে জানাব।

পরদিন ফোনে মানা করে দিল। ওর তো পরীক্ষা। এখন নাটকে গেলে পরীক্ষা খারাপ হবে। বড়টাকে নিলে নিতে পারেন।

পলিটিক্সটা বুঝলাম। বুঝে সরাসরি মানা করে দিলাম। না, ঠিক আছে। অন্য কাউকে নিয়ে নেব।

তারপর শাম্মিকে খুঁজে বের করে দিলেন আমার ক্যামেরাম্যান লাল ভাই।

কিন্তু শাম্মিদের বাড়ি হবে কোনটি?

আমার সঙ্গে নাটকের ডিরেক্টর রিয়াজ সাহেব, ক্যামেরাম্যান লাল ভাই আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হারুন। ঢাকা থেকে মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছি। মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে মাঠের ধারে। খানিক আগে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এই শুটিংস্পটের কেয়ারটেকার আবুল। রিয়াজ সাহেবের বিশেষ পরিচিত। তার সঙ্গেই কথা বলছিল।

লাল ভাই বললেন, স্পট পছন্দ হলো?

আমি কথা বলার আগেই রিয়াজ সাহেব বললেন, পছন্দ হওয়ার কথা। স্ক্রিপ্ট আমি পড়েছি। স্ক্রিপ্টের সঙ্গে স্পট মিলে যাচ্ছে। স্ক্রিপ্ট পড়ার পরই জায়গাটি আমি চয়েস করেছি।

রিয়াজ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, থ্যাংক য়ু ভেরি মাচ। পারফেক্ট জায়গা বের করেছেন। এখন বলুন চম্পাদের বাড়ি হবে কোনটি?

আছে। একদম ওরকম বাড়িই আছে।

তাই নাকি! চলুন দেখি।

আগে আবুল ভাইয়ের সঙ্গে কথা শেষ করি।

জি প্লিজ।

আমরা তো চারটি বোথ শিফট করতে চাইছি, না?

হ্যাঁ। তিনটে রাত এখানে সবাই থাকবে। থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

আবুল বলল, তা করতে পারব। তবে থাকতে হবে একটু কষ্ট করে।

কেন?

কাল থেকে একটি ফিল্ম ইউনিটও থাকবে।

রিয়াজ সাহেব বললেন, গানের সিকোয়েন্স নাকি?

বলতে পারি না।

গানের সিকোয়েন্স হলে আমাদের রেকর্ডিংয়ে প্রবলেম হবে।

যাতে না হয় ব্যবস্থা করে দেব। চিন্তা করবেন না।

বুঝলাম আবুল লোকটি সব দিক ম্যানেজ করে চলতে পারে। এ ধরনের লোক আমার বেশ পছন্দ। বললাম, আপনি তাহলে সেভাবেই ব্যবস্থা করুন। পরশু থেকে রেকর্ডিং করব আমরা। আজ বিকেলে জিনিসপত্র চলে আসবে আমাদের। অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিশিয়ানরা থাকবে। আমরা আসব পরশু সকালে।

আসেন, কোনো অসুবিধা নাই।

আমি তারপর রিয়াজ সাহেবের দিকে তাকালাম। চলুন তাহলে ওই বাড়িটি দেখি।

আবুল বলল, ওখানে শুটিং চলছে।

রিয়াজ সাহেব বললেন, কিসের শুটিং?

সিনেমার। আজই ওদের কাজ শেষ হবে। কাল থেকে অন্য পার্টির কাজ।

শুটিংয়ের সময় বাড়িটি আমরা দেখতে পারব না?

তা পারবেন।

চলুন তাহলে যাই।

চলুন।

বড়লোক বাড়ির পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলাম আমরা। এদিকে বাউন্ডারি ওয়াল। লোহার বেশ বড় একখানা গেট আছে। গেটে তালা দেয়া ছিল। কোমর থেকে চাবি বের করে তালা খুলল আবুল। আমরা বেরিয়ে এলাম।

গেটের বাইরে পুবে-পশ্চিমে মেঠোপথ। দুদিকেই পথ হারিয়ে গেছে গজারি বনের ভেতর। পথের উত্তরে সবুজ ঘাসের ছোট্ট মাঠ। মাঠের পশ্চিমে পরিপাটি সেগুনবাগান, উত্তরে কলাবাগান। পুব দিকে হতদরিদ্র এক গৃহস্থবাড়ি। চারটি কুঁড়েঘর বাড়িতে। বারবাড়ির সামনে ভাঙাচোরা গোয়ালঘর, দুটো খড়ের গাদা।

দেখে আবার মুগ্ধ হই আমি। এই তো চম্পাদের বাড়ি! এই তো আমার লেখার মতো বাড়ি!

বাড়িতে বেশ একটা ভিড় লেগে আছে এখন। উঠোনে ক্যামেরা। ক্যামেরার পাশে ক্যামেরাম্যান ও ডিরেক্টর। দুজনের মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে দুজন বয়। পশ্চিম দিককার কুঁড়েঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নায়িকা।

বাড়ির ভেতর উঁকি মেরে উৎফুল্ল হলেন রিয়াজ সাহেব। আরে, বেলাল আহমেদের ছবি নাকি! বেলাল আমার বন্ধু। চলুন যাই। শুটিং চলা অবস্থায়ও পুরো বাড়ি ঘুরে দেখতে পারবেন। কোনো অসুবিধা নেই।

আমরা বাড়িতে ঢুকলাম। রিয়াজ সাহেবকে দেখে হইহই করে উঠলেন বেলাল আহমেদ। আরে, আমার দোস্ত এসে পড়েছে! দশ মিনিটের জন্য শুটিং প্যাকাপ।

বেলাল আহমেদের সঙ্গে রিয়াজ সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমি নায়িকাটিকে চেনার চেষ্টা করলাম। চিনতে পারলাম না। নতুন মেয়ে। আজকাল অনেক মেয়ে সিনেমার নায়িকা হয়ে আসছে, প্যাকেজ নাটকেও কিন্তু চোখে পড়ার মতো একজনও নেই। এজন্য আমার নাটক আমি শমী, তৌকীরকে নিয়েই করছি।

বেলাল আহমেদ বললেন, চা খাবে নাকি রিয়াজ?

রিয়াজ সাহেব বললেন, এটি আবার জিজ্ঞেস করছ?

সঙ্গে সঙ্গে চা এল। উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। ঠিক তখুনি মহিলাকে চোখে পড়ল। উত্তর দিককার কুঁড়েঘরটির পৈঠা লেপছে। হাতের কাছে ছোট্ট বালতি। বালতিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে তুলছে আর অতিযত্নে পৈঠা লেপছে। সাদা থান পরা। মাথায় গৃহস্থবাড়ির বউঝিদের মতো ঘোমটা দেয়া। লেপাপোছার কাজ করছে, কিন্তু শাড়িতে ময়লা লাগেনি। ফলে চট করে দেখেও বাড়ির ঝি তাকে মনে হয় না।

এসব কারণেই কি না কে জানে, আমি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মহিলাকে দেখতে থাকি। ষাটের কাছাকাছি হবে বয়স। বয়সের ছাপ বেশ ভালোভাবেই পড়েছে মুখে। ঘোমটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েক গোছা চুল। সেই চুলের প্রায় পুরোটাই সাদা। তার এত কাছে সিনেমার শুটিং হচ্ছে, কিন্তু একবারও তাকে সেদিকে তাকাতে দেখি না। আপনমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

ততক্ষণে বেলাল আহমেদ আবার শুটিং শুরু করেছেন। বারান্দায় দাঁড়ানো নায়িকার ওপর আলো ফেলা হয়েছে। বারান্দার ছায়াও প্রখর আলোয় ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। দিনের আলোর সঙ্গে মিলেমিশে আশ্চর্য এক আলোকিত ভাব বাড়িতে। এই আলোর অদূরে সেই মহিলা আপনমনে পৈঠা লেপছে।

তার জীবন তার পরনের শাড়ির মতোই বিবর্ণ। মাত্র কয়েক হাত দূরের আলোকিত জগৎ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

আলোর পাশে অন্ধকার কি এভাবেই থাকে!

সিনেমার নায়িকার অদূরে জীবন-সিনেমায় মার খাওয়া, সম্পূর্ণ ব্যর্থ আরেক নায়িকা তার মতো করে তার কাজ করে যায়। একটিমাত্র ক্ষেত্রে তাদের দুজনের বড় মিল। কাজ করে রোজগার করা, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা। একজনের কাজ অভিনয় দেখিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন, আরেকজনের কাজ যেখানে দাঁড়িয়ে নায়িকা অভিনয় করবে সেই জায়গাকে লেপেপুছে পরিচ্ছন্ন রাখা।

এসব ভেবে ভেতরে ভেতরে একটু হাসিও পায় আমার। যাব্বাবা, প্যাকেজ নাটকের শুটিংস্পট দেখতে এসে দেখি ফিলোসফার হয়ে গেলাম!

রিয়াজ সাহেব ততক্ষণে একটি মোড়ায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর পাশে লাল ভাই, হারুন এবং মাইক্রোবাসের ড্রাইভারও আছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে শুটিং দেখছে।

রিয়াজ সাহেব হাসি হাসি মুখ করে বললেন, একটি মোড়া দিতে বলি। আপনিও বসুন। আধঘণ্টা খানেক শুটিং দেখি।

আপনারা দেখুন। আমি বরং চারদিকটা একটু ঘুরে দেখি।

প্লিজ।

আমি সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। কলাবাগানের পাশে যে সবুজ মাঠ, সেই মাঠে উদাস হয়ে হাঁটতে থাকি। ঘুরেফিরে মহিলার কথা মনে হয়। কেন কে জানে!

খানিক পর মহিলাকে দেখি ধীর, নরম ভঙ্গিতে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কাজ শেষ করে হাত ধুয়েছে। এখন শাড়ির আঁচলে হাত মুছছে।

আমার খুব ইচ্ছে করে মহিলার সঙ্গে কথা বলি। সে কি এখানেই থাকে, নাকি দূরের কোনো গ্রাম থেকে এসে কাজ করে যায়! সংসারে কে কে আছে! কী নাম?

আস্তেধীরে হেঁটে মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

মহিলা আড়ষ্ট হলো। মাথায় ঘোমটা ছিল, সেই ঘোমটা আরো যত্নে টানল। কুণ্ঠিত গলায় বলল, কী কথা বাবা?

তেমন জরুরি কিছু না। আবুল কি আপনার কিছু হয়?

এখানকার ম্যানেজার আবুলের কথা বলছেন?

জি।

না, সে আমার কিছু হয় না। আমি এখানে কাজ করি।

কী কাজ?

মাটির ঘরগুলোর লেপাপোছার কাজ, উঠান লেপাপোছার কাজ।

বেতন পান কত?

সাত শো টাকা পাই।

সপ্তাহে কদিন কাজ করেন?

রোজই করি।

বলেন কী! রোজ?

হ্যাঁ বাবা।

কতক্ষণ কাজ করতে হয়?

কোনো কোনো দিন সারা দিন করি। কোনো কোনো দিন একবেলা। যেদিন যেমন কাজ থাকে।

আজ কতক্ষণ করবেন?

আজ আর করব না। আজকের কাজ শেষ।

এখানেই থাকেন?

না বাবা। আমাদের বাড়ি এখান থেকে দেড় মাইল দূরে। গ্রামের নাম রতনপুর।

শুনে অবাক হলাম। দেড় মাইল দূর থেকে রোজ কাজে আসেন? মাত্র সাত শো টাকা বেতন? এতে পোষায়?

মহিলা মৃদু হাসল। না পোষাইলেই বা কী করব, বাবা? এই টাকায়ই কষ্টসৃষ্ট করে চলতে হয়।

সংসারে কে কে আছে?

মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেউ নাই।

জি?

হ্যাঁ বাবা। আপন বলতে কেউ নাই আমার।

স্বামী, ছেলেমেয়ে?

না, কেউ নাই। একটি মেয়ে ছিল। আট-নয় বছর বয়সে মারা গেছে। খুব জ্বর হয়েছিল। জ্বরের ঘোরে কখন মারা গেল টেরই পেলাম না।

আপনার স্বামী?

সে মারা গেল যুদ্ধের সময়। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়। মিলিটারিরা মারল।

কোথায়?

আমাদের গ্রামেই। আমাদের গ্রামে বেশ কয়েক ঘর হিন্দু ছিল। গরিব হিন্দু। কামার, কুমার, মুচি। আমাদের ছিল কুমারবাড়ি। মিলিটারিরা তো হিন্দু মেরে সাফা করে ফেলতে চাইল। রতনপুরে ঢুকে চারদিক দিয়ে হিন্দুপাড়াটায় আগুন দিল। তার আগেই যে যেদিকে পারে ছুট দিয়েছে। নয়নতারার বাবা ছিল ল্যাংড়াখোঁড়া মানুষ...

নয়নতারা কে?

আমার মরা মেয়ে।

বুঝেছি। বলুন, তারপর? কীভাবে ল্যাংড়া হয়েছিল সে?

মুক্তিযুদ্ধের কয়েক মাস আগ থেকে ডান পায়ের হাঁটুতে খুব ব্যথা হতো। মাঝেমধ্যে পা একেবারে নাড়াতেই পারত না, হাঁটতে পারত না। তার কাজকর্ম করতে হতো আমার।

কী কাজ?

কুমারদের যা কাজ। মাটির হাঁড়ি-কলসি তৈরি করা।

পারতেন?

মহিলা হাসল। পারব না কেন? আমরা কুমারবাড়ির মেয়ে না? আমার বাপ-দাদারা কুমার ছিল, শ্বশুরদিককার সবাই কুমার। কুমারবাড়ির মেয়েরাও এসব কাজ করে।

কথা বলতে বলতে, হাঁটতে হাঁটতে আমরা তখন গ্রামের বড়লোক বাড়িটির সামনের মাঠে চলে এসেছি। দুপুর ফুরিয়ে এসেছে। রোদ নরম

হতে শুরু করেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠ এবং ঘরের চালায় রোদের রং বদলে গেছে।

মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, তারপর?

আমাদের গ্রামে জলধর ডাক্তার নামে একজন ডাক্তার ছিল। নয়নতারার বাবার পা দেখে তিনি বললেন, হাড়ের ভেতর যক্ষ্মা হয়েছে। অষুধে ভালো হবে না। ঢাকায় একটা পঙ্গু হাসপাতাল আছে, সেখানে নিয়ে অপারেশন করাতে হবে। আমরা গরিব মানুষ। দিন আনি দিন খাই। আমরা অত দামি চিকিৎসা কীভাবে করাব? আমাদের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজনও নাই যে সাহায্য করবে।

আত্মীয়স্বজন নেই মানে? আত্মীয়স্বজন ছাড়া মানুষ হয় নাকি? আপনার দিককার, নয়নতারার বাবার দিককার কোনো আত্মীয় আপনাদের নেই?

একসময় ছিল বাবা, অনেকেই ছিল। কুমারের কাজে পোষায় না দেখে পেশা বদল করেছে। বাড়িঘর বিক্রি করে একেকজন চলে গেছে একেকদিকে। পেটের আহার জোটাতেই জান যায় একেকজনের, কে কার খোঁজ রাখবে? নয়নতারার বাবার পা নষ্ট না হলে সেও পেশা বদলাত। ঢাকায় গিয়ে অন্য কোনো কাজ করত। কুমারের কাজে দিন আর চলছিল না, বাবা। মাটির জিনিসের আজকাল আর কদর নাই। সবাই অ্যালুমিনিয়ামের জিনিস চায়, কাচের জিনিস চায়। আমাদের দুজন মানুষের সংসার, দুজনে কাজ করেও সংসার ঠিকমতো চালাতে পারতাম না। নয়নতারার বাবা যখন ভাবছে, এই পেশা ছেড়ে অন্যদের মতো সেও গ্রাম ছাড়বে, তখনই পায়ের অসুখটা হলো। তার কিছুদিন পর শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধের সময় কে কোথায় যাবে? কী কাজ করবে? তার ওপর আমরা হলাম হিন্দু মানুষ! হিন্দু শুনলেই মিলিটারিরা গুলি করে মারে। রাজাকার, শান্তিবাহিনীর লোকেরা মারে। খেয়ে না-খেয়ে আমাদের তখন ঘরে বসে দিন কাটে। এই সময় একদিন মিলিটারি গ্রামে এল। হিন্দুপাড়ায় আগুন দিল। যে যেদিকে পারে জান নিয়ে পালাল। কিন্তু নয়নতারার বাবার পায়ে ব্যথা। এমন ব্যথা, ব্যথার চোটে জ্বর এসেছে। কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে ঘরে। নড়াচড়ার শক্তি নাই। মিলিটারিদের আগুনে জ্যান্ত মানুষটি চিতায় উঠল।

মহিলার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আনমনা হয়ে পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

আমার কোনো হুঁশজ্ঞান ছিল না, বাবা। এখন যা বয়েস, এর অর্ধেক বয়েস তখন। শুনেছি মেয়েছেলে পেলে জানে মারে না মিলিটারিরা। অন্যভাবে যে মারা মারে তারচে হাজারবার মরে যাওয়া ভালো। সেই ভয়ে নয়নতারার বাবার কথা ভুলে যেদিকে দুচোখ যায় ছুটতে শুরু করেছিলাম। ফিরে আসি সন্ধ্যার দিকে। এসে দেখি হিন্দুপাড়ায় কিচ্ছু নাই। চারদিকে শুধু ছাই, ধিকিধিকি আগুন। পাড়াটা যেন চিতাখোলা হয়ে গেছে। কোথায় মিশে গেছে নয়নতারার বাবা!

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, তার মানে এখন আর কেউ নেই আপনার?

না, আমি একা।

বাড়িঘর আছে তো?

মহিলা দুঃখের হাসি হাসল, বাড়িঘরের কথা কী বলব, বাবা! সে আরেক কাহিনি।

বলুন, শুনি।

আমাদের ছিল বারো শরিকের বাড়ি। বারো ঘরের মানুষের জন্য একখানা উঠান। পুড়ে বাড়িটা যখন চিতাখোলা হয়ে গেল, চিতাখোলায় মানুষ থাকে কী করে? নতুন করে ঘর উঠাবার সামর্থ্যও নাই কারো। যে যেদিকে পারে, যার বাড়িতে পারে গিয়ে আশ্রয় নিল। আশপাশের গ্রামের মুসলমানরাই জায়গা দিল আমাদের। আর সেই ফাঁকে যে কাণ্ডটা হলো, কী বলব, আমাদের বারো শরিকের বাড়িটা, পুরো বাড়িটা বেদখল হয়ে গেল।

বলেন কী! কারা করল?

নাম বলব না, বাবা। তাদের কানে যদি যায় যে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছি আমাদের বাড়ি তারা দখল করেছে, আমাকে তাহলে জানে মেরে ফেলবে। আমরা কেউ তাদের নাম বলতে সাহস পাই না।

কোথাকার লোক তারা?

আমাদের গ্রামেরই।

মুসলমান?

মুসলমান।

বাড়িটি তারা দখল করল কখন? স্বাধীনতার পর?

না, যুদ্ধের সময়ই। বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার দিন সাতেক পরই। তখন তারা খুব ক্ষমতাবান ছিল। শান্তি কমিটির লোক।

স্বাধীনতার পর তো তাহলে বাড়ি আপনাদের ফিরে পাওয়ার কথা?

পাইনি।

কেন?

স্বাধীনতার পরও দেখি তারা আগের মতোই ক্ষমতাবান। তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না। প্রথম প্রথম কিছুদিন একটু নরম দেখেছি তাদের। আমরা সবাই দল বেঁধে গিয়েছি, যাতে বাড়ি ছেড়ে দেয়। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কয়েক মাস ঘুরিয়েছে। তারপর একদিন আগের চেহারা ধরেছে। খবরদার, যদি আর কোনো দিন বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখি তাহলে একজনেও জান নিয়ে ফিরতে পারবি না। প্রত্যেকের লাশ ফেলে দেব। আমরা গরিব মানুষ, কেমন করে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? তারপর থেকে যে যার জান নিয়ে সরে থাকি। বাড়ির ত্রিসীমানায় যাই না।

একটু থেমে সে বলল, একটা কথা বলব, বাবা?

বলেন।

পাকিস্তানি মিলিটারিদের মতো অনেক লোক এখনো আছে এই দেশে। গোপনে গোপনে কত মানুষ যে তারা মারে, কেউ টের পায় না। কতজনের ঘরবাড়ি দখল করে নেয়, কত মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে, কেউ দেখে না।

মহিলার কথা শুনে চমকে উঠি। দারুণ বলেছেন। বেশ তাৎপর্যপূর্ণ কথা। কিন্তু এই নিয়ে আর কথা বলি না। জিজ্ঞেস করি, এখন তাহলে কোথায় থাকেন আপনি?

রতনপুরেই থাকি। এক মুসলমান বাড়িতে। বাগানের দিকে তারা আমাকে ছোট্ট একখানা ঘর তুলে দিয়েছে। সেই ঘরে থাকি। আগেও মাটির কাজ করতাম, এখনো করি। তবে তখনকার কাজটা ছিল এক রকম, এখনকারটা আরেক রকম। সাত শো টাকা বেতনে জীবনটাও কোনো রকমে চলে যায়।

যে বাড়িতে থাকেন তারা লোক কেমন?

তাদের কোনো তুলনা হয় না। তারা মানুষ না, দেবতা। ভগবানের পৃথিবীতে বাবা দেবতাও থাকে, অসুরও থাকে। এক অসুরে স্বামী মেরেছে, আরেক অসুরে করেছে বাড়ি দখল। কিন্তু আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষের মতো চেহারার একজন দেবতা।

এত ভালো লাগল মহিলার কথা! প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে একজন দার্শনিক থাকে, অনেক দিন পর তা টের পেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, এত কথা বললাম, মহিলার নামটা এখনো জানা হয়নি। বললাম, আপনার নামটা...

সে লাজুক গলায় বল, সূর্যমুখী।

শুনে সোফিয়া লোরেনের একটি ছবির কথা মনে পড়ল। সানফ্লাওয়ার। গভীর প্রেমের ছবি। চমৎকার যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য ছিল ছবিতে। এই ছবিতে যুদ্ধ ছিল সূর্যের ভূমিকায়, মানুষজন ছিল সূর্যমুখী ফুল। যুদ্ধ তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সূর্য যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সূর্যমুখী ফুলকে। যখন যেদিকে ঘোরে সূর্য, নিজের মুখ সেদিকে ঘোরায় সূর্যমুখী।

রতনপুরের সূর্যমুখীর জীবনটাও সানফ্লাওয়ারের নায়িকার মতো। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর জীবন। স্বাধীনতার সূর্য যখন যেদিকে ঘুরেছে সূর্যমুখীও তার মুখ ঘুরিয়েছে সেই দিকে।

তখন পুরোপুরি বিকেল। সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে। সূর্যমুখীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুটিংস্পটের বাইরের রাস্তায় চলে এসেছি। এই রাস্তা পুবে-পশ্চিমে।

সূর্যমুখী বলল, আমি তাহলে যাই, বাবা?

আসুন। অনেক কথা বললাম আপনার সঙ্গে, কিছু মনে করবেন না।

না, মনে করব কেন? আমারও তো ভালো লাগল বলতে। অনেক দিন পর নিজের সব কথা একজনকে বলতে পারলাম।

সূর্যমুখী পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাল। এইদিকে রতনপুর।

আকাশের সূর্য তখন পুরোপুরি ঢলেছে পশ্চিমে।

২০০০

লোকটি রাজাকার ছিল

চোখের বাঁধন খুলে দেয়ার পর বোঝা গেল লোকটি খুবই নির্বোধ ধরনের। জগৎ-সংসারের অনেক খবরই সে রাখে না। চেহারায় অলস আয়েশি ভাব। মাথার চুল কদম ছাঁট দেয়া, কিন্তু রুক্ষ নয়, তেল দিয়ে বেশ পরিপাটি করা। মুখের ঘন কালো দাড়িগোঁফ যতনে ছাঁটা। চোখের কোণে বুঝি সুরমা ছিল, চেপে চোখ বাঁধার ফলে মুছে গেছে। পরনে হাতাওয়ালা কোরা গেঞ্জি আর নীল ডোরাকাটা লুঙি। গেঞ্জি-লুঙি কোনোটাই খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। হাত দুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা। এ অবস্থায়ও সে যে বেশ দশাসই এবং তাগড়া জোয়ান বুঝতে কারো অসুবিধা হচ্ছিল না।

লোকটির দুপাশে দুজন মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনই অল্পবয়সি। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে। মাথার রুক্ষ চুল ঘাড় ছাপিয়ে নেমেছে। ভাঙাচোরা মুখ অতিরিক্ত পরিশ্রমে চোয়াড়ে হয়ে গেছে। ভাইরাস আক্রান্ত চোখ লাল টকটকে। চোখের কোণে গাঢ় হয়ে জমেছে কালি। দেখে বোঝা যায়, একটি রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমোয় না তারা। দুজনেরই কাঁধে রাইফেল। রাইফেল এবং তাদের শরীরের কাঠামো প্রায় একই ধরনের। একহারা, ঋজু। যদিও লোকটির দুপাশে তাদের দুজনকে অতিরিক্ত রোগা এবং ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, তবু কাঁধের রাইফেল ও শরীর মিলেমিশে এমন একটা রূপ নিয়েছে, কোনটি যে কখন গর্জে উঠবে বোঝা যাচ্ছিল না।

স্কুলঘরটির ভেতর অদ্ভুত এক নির্জনতা। বাইরে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে নভেম্বরের বিকেল। মৃদু শীত এবং অন্ধকার একাকার হয়ে এমন এক আবহ তৈরি করেছে ঘরের ভেতর, এই অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসার কথা মানুষের। বিশেষ করে অপরাধীদের। কিন্তু লোকটি নির্বিকার। হাত দুটো

এখনো বাঁধা। দুপাশে রাইফেল কাঁধে দুজন মুক্তিযোদ্ধা, সামনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসা একজন, টেবিলের ওপর, তার হাতের কাছে রাখা স্টেনগান। এসব দেখে যতটা ভয় পাওয়ার কথা ততটা ভয় সে পেয়েছে কিংবা পাচ্ছে বলে মনে হয় না। বরং তার চোখে-মুখে চাপা একটা কৌতূহল। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিন মুক্তিযোদ্ধার দিকে তাকাচ্ছিল।

চেয়ারে বসা মুক্তিযোদ্ধার নাম রফিক। বয়স তিরিশের ওপর। রোদে পোড়া তামাটে মুখ। একদা যে ফরসা ছিল, মুখ দেখে বোঝা যায়। তার চোখ এখনো ভাইরাস-আক্রান্ত হয়নি। অন্য দুজন মুক্তিযোদ্ধার মতো তার চোখের কোণেও গাঢ় হয়ে জমেছে কালি। তবে চোখের কালি ছাপিয়েও তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনি চোখে পড়ে। দৃষ্টিতে একসঙ্গে অনেক কিছু খেলা করে।

অন্য দুজন মুক্তিযোদ্ধার মতো রফিকের মুখেও অনেক দিনের দাড়িগোঁফ এবং সে বেশ লম্বা। স্কুলঘরের হাতলওয়ালা চেয়ার ছাপিয়ে অনেক দূর উঠেছে দেহ। রফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটিকে দেখছিল। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাবে, তার আগেই লোকটি খুব সরল গলায় বলল, আমারে বাইন্ধা আনছেন কেন? আপনেরা কারা?

রফিক গম্ভীর গলায় বলল, চোপ। কোনো কথা বলবে না। যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার জবাব দেবে। অতিরিক্ত একটি কথা বললে গুলি করে দেব। এটা কী দেখেছ?

টেবিলের ওপর রাখা স্টেনগান দেখাল রফিক। আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটি খুব একটা ভয় পেল বলে মনে হলো না। হাসি হাসি মুখ করে রফিকের দিকে তাকাল। আদুরে গলায় বলল, দেখছি। বন্দুক। কয়দিন পর আমিও এই রকম বন্দুক পামু। কমন্ডার সাবে কইছে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রফিক। চোপ। তোমাকে না বলেছি অতিরিক্ত কথা বলবে না।

তা বলছেন!

তবে?

কিন্তু দুই-একখান কথা তো না জিগাইয়া পারতাছি না। আমারে বাইন্ধা আনছেন কেন? আমার অপরাধ কী? আপনেরা কারা?

লোকটির দুপাশে দাঁড়ানো দুজন মুক্তিযোদ্ধার একজনের নাম মজনু, আরেকজনের বাচ্চু। বাচ্চু আমুদে স্বভাবের। কথায় কথায় শব্দ করে হাসে। লোকটির কথা শুনে হেসে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে শীতল চোখে তার দিকে তাকাল রফিক। গম্ভীর গলায় বলল, বাচ্চু।

বাচ্চু বুঝে গেল এরপর রফিক ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া শব্দ করা যাবে না। পাথর হয়ে থাকতে হবে।

বাচ্চু পাথর হয়ে গেল।

লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে রফিক বলল, নাম কী?

লোকটি আহ্লাদি শিশুর মতো ঠোঁট ফুলাল। কইতে পারুম না। হাতবান্ধা মানুষ কথা কইতে পারে?

নিজে খুবই গম্ভীর স্বভাবের মানুষ রফিক। সহজে হাসে না। কিন্তু এ রকম কথা শুনলে কে না হেসে পারে! রফিকও হাসল। কিন্তু বাচ্চু কিংবা মজনু হাসল না। রফিকের আদেশ ছাড়া হাসা যাবে না। তবে তাদের দুজনেরই হাসির চাপে বুক ফেটে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা বুঝল রফিক। সে একটু নরম হলো। হাসিমুখে বাচ্চু ও মজনুর দিকে তাকাল। হালকা কৌতুকের গলায় বলল, ভালো জিনিস ধরে এনেছিস। এটা নিয়ে মজা করা যাবে। যুদ্ধের ফাঁকে মজাও দরকার। তাতে এনার্জি বাড়ে। নাসিরদের ডাক। মজাটা সবাই মিলে করি। তারপর খালপাড় নিয়ে যাব।

বাচ্চু উচ্ছল গলায় বলল, ঠিক আছে।

মিনিটখানেকের মধ্যে দশ-বারো জন মুক্তিযোদ্ধা এসে ঢুকল ঘরে। লোকটির চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়াল। রফিকের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় হবে এমন একজন, নাম আজমত, লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, নিয়ে যাব?

রফিক হাসিমুখে বলল, একটু পরে। তোমাদের ডেকেছি জিনিসটি দেখাবার জন্য। নাম জিজ্ঞেস করেছি, বলল, কইতে পারুম না। হাতবান্ধা মানুষ কথা কইতে পারে?

শুনে হো হো করে হেসে উঠল সবাই। আজমত হাসল না। বলল, এভাবে কথা বলা চালিয়াতিও হতে পারে। রাজাকারদের তো চেনো না! শালাদের চালিয়াতির সীমা-পরিসীমা নেই।

রফিক কথা বলার আগেই লোকটি ভুরু কুঁচকে আজমতের দিকে তাকাল। খেঁকুড়ে গলায় বলল, ওই মিয়া, শালা কারে কইলেন? আমারে?

আজমত একটু থতমত খেল। তারপর শীতল চোখে লোকটির দিকে তাকাল। হ্যাঁ, তবে ভুল বলেছি। তুমি কারো শালা হওয়ার উপযুক্ত নও। তুমি একটা শুয়োরের বাচ্চা।

পরিবেশ ভুলে ক্রোধে ফেটে পড়ল লোকটি। খবরদার, গাইল দিবেন না। হাতটা বান্ধা! নাইলে আপনেরে দেইখা লইতাম, কেমনে গাইল দেন। সাহস থাকলে হাত ছাইড়া দেন।

রফিকের দিকে তাকিয়ে হাসল আজমত। তোমার অনুমানই ঠিক। এটা একটা জিনিস।

রফিক বলল, তাহলে হাতের বাঁধনটা খুলে দাও। মজা করি।

লোকটির হাতের বাঁধন খুলে দিল আজমত।

রফিক বলল, পালাবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে আর খালপাড় পর্যন্ত নেয়া যাবে না।

লোকটি সে কথা শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না। একবার ডান হাত একবার বাঁ হাত ডলছে আর মুখে চুক চুক শব্দ করছে। ইশ্! মানুষ মানুষরে এমনে বাইন্ধা আনে? দেহেন তো হাত দুইডার কী করছেন? ও মিয়ারা, আমি কি চোর যে আমারে আপনেরা বাইন্ধা আনছেন?

মজনু বলল, তুমি চোর না, চোরের বাপ। রাজাকার।

রজাকার হইছে কী হইছে? মানুষ রজাকার হয় না?

শুনে আবার হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

বাচ্চু বলল, শালা নিজেদের নাম পর্যন্ত ঠিকমতো বলতে পারে না। রাজাকারকে বলছে রজাকার।

রফিক গম্ভীর গলায় বলল, আস্তে। এখন আর হাসিঠাট্টা না। আমি কথা বলব।

সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে রফিক বলল, নাম কী?

লোকটি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। এইবার কওন যায়। তার আগে কন, আপনেরা কারা? বেবাকতের লগে বন্দুক, ডাকাইতের লাহান চেহারা! ডাকাইত হইলে আমারে ধরছেন কেন? মাইরা ফালাইলেও চাইর আনা পয়সা দিতে পারুম না। আমি পথের ফকির। ভাত জোটে না দেইখা রজাকার হইছি। সত্য কইরা কন, আপনেরা কারা?

রফিক কথা বলল না। আস্তে করে চেয়ার ঠেলে উঠল। নরম ভঙ্গিতে গিয়ে দাঁড়াল লোকটির সামনে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুহাতে প্রচণ্ড দুটো চড় মারল লোকটির দুই গালে। আমরা তোর যম শুয়োরের বাচ্চা। মুক্তিযোদ্ধা।

হঠাৎ এমন দুখানা চড় খেয়ে খুবই দিশেহারা হলো লোকটি। তবু মুক্তিযোদ্ধা কথাটা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে রফিকের মুখের দিকে তাকাল। অবাক গলায় বলল, আপনেরা মুক্তিবাহিনী? দেখতে তো দেশগেরামের পোলাপানের লাহানই। আমি তো মনে করছিলাম মুক্তিবাহিনী না জানি কেমুন দেখতে!

এবার লোকটির তলপেট বরাবর প্রচণ্ড একটি লাথি মারল রফিক। আবার কথা!

লাথি খেয়ে কাবু হলো লোকটি। কাঁদো কাঁদো মুখে রফিকের দিকে তাকাল। ভয়ে আর কথা বলল না।

চেয়ারে বসে রফিক বলল, নাম কী?

নিজাম।

কত দিন হলো রাজাকার হয়েছ?

এক মাস বারো দিন।

কেন হয়েছ?

পেটের দায়ে।

পেটের দায়ে কথাটা শুনে ঘরের ভেতরকার প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা স্তব্ধ হয়ে গেল।

নিজাম ঢোক গিলে বলল, ছোড ছোড চাইরডা পোলাপান লইয়া না খাইয়া থাকি। দেশগেরামে কোনো কাম নাই। চাইর দিকে গণ্ডগোল।

রফিক বলল, আগে কী করতে?

কামলা দিতাম। মাইনষের খেতখোলায় ধান কাটতাম, পাট কাটতাম, খেত চষতাম। ফসলের মাস না হইলেও গিরস্তবাড়িত নানান পদের কাম আছিল। খাইয়া-পইরা বাঁচতাম। অনেকদিন ধইরা দেশগেরামে কোনো কাম নাই। পেট চলে না। খিদায় পোলাপানডি রাইত দিন কান্দে।

রাজাকার হওয়ার বুদ্ধি কে দিল?

চেরমেন সাবে।

তার কাছে গিয়েছিলে কেন?

কামের আশায়। বিপদে পড়লে দেশগেরামের মানুষ চেরমেনের কাছেই যায়। গিয়া কাম চাইলাম। কইল, ভালা কাম আছে, করো। তারবাদে রজাকারিতে লাগাইয়া দিল।

এ কাজে কি তোমার পেট চলছে?

হ, চলতাছে। নাম লেখানোর লগে লগে এক শো টেকা দিল কমন্ডার সাবে। দিয়া কইল বাড়িতে বাজার কইরা দে। তারবাদে টেরনিং হইব।

ট্রেনিং হয়েছে?

না, অহনতরি হয় নাই। লুঙ্গিগেঞ্জি দিছে, শীতের কাপড় দিছে, জুতা দিছে, হেইডি পিন্দা বাঁশের একখান লাডি হাতে লইয়া বাজারে ঘুইরা বেড়াই, গুদারা ঘাডে যাই, মুক্তিবাহিনী আছেনি, সম্বাত লই। তয় মুক্তিবাহিনীর খালি নামই হুনছি, আইজ পয়লা দেখলাম।

মিলিটারি দেখেছ?

না, কমন্ডার সাবে দেখছে। তার লগে মেলেটারিগো বিরাট খাতির। আমরা হইলাম ছোড রজাকার, আমরা তাগো দেখুম কই থিকা?

নিজামের কথা বলার ধরন আন্তরিক। প্রিয়জনদের কাছে সুখ-দুঃখের গল্প করার ভঙ্গিতে কথা বলছে। মুক্তিযোদ্ধারা স্তব্ধ হয়ে তার কথা শুনছে। তারা বুঝে গেছে, এই সরল গ্রাম্য লোকটি মিথ্যে বলছে না।

তোমাকে রাইফেল দেয়নি কেন?

কমন্ডার সাবে কইছে আরো পরে দিব। আমি আর একটু চালু হইলে। আবার না-ও দিতে পারে। সব রজাকাররে রাইফেল-বন্দুক দেয় না। কিছু ফালতু রজাকারও আছে। আমি হইলাম ফালতু। তয় রজাকার হইয়া আমি

বেদম সুখে আছি সাব। চাইল-আটা পাই, টেকা-পয়সা পাই। পোলাপানডি অহন আর খিদায় কান্দে না। এক-দেড় মাসে আমার চেহারাসুরত ভালো হইয়া গেছে।

একটু হেসে ভয়ে ভয়ে নিজাম বলল, আপনেগো কেউর কাছে বিড়ি হইব সাব? মাইর খাইয়া গলা শুকাইয়া গেছে। বিড়ি টানলে কথা কইতে সুবিধা।

রফিক তার বুকপকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল। একটা সিগ্রেট ছুড়ে দিল নিজামের দিকে। ম্যাচ দিল। নিজাম সিগ্রেট ধরিয়ে ফুক ফুক করে দুটো টান দিল, মাটিতে আয়েশ করে বসল। একটু আরাম কইরা বহি সাব, বইয়া বিড়িডা খাই।

রফিক বলল, তাহলে তুমি পেটের দায়ে রাজাকার হয়েছ?

নিজাম সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ সাব, আর কোনো কারণ নাই।

রাজাকার হওয়ার আর কী কী কারণ থাকতে পারে, তুমি জানো?

না সাব।

মিলিটারি কাকে বলে, মুক্তিযোদ্ধা কাকে বলে জানো?

জানি। মেলিটারি হইল এই দেশের মালিক, আর মুক্তিবাহিনীরা হইল...

কথা শেষ না করে থেমে গেল নিজাম। ভয়ে ভয়ে রফিকের মুখের দিকে তাকাল। কমু না সাব। আপনেরা মুক্তিবাহিনী। কইলে আপনেরা আমারে মাইরা ফালাইবেন। তয় এত কিছু আমি বুজতাম না। আমি বুজতাম খালি পেডের খিদা। চেরমেন সাবে এই সব আমারে বুজাইছে।

তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে।

হইতে পারে। চেরমেন সাবে বহুত মিছা কথা কয়। আমরা সাব গরিব মানুষ, কিন্তু মিছা কথা কই না।

আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আমাদের দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?

আগেই তো কইলাম, দেশগেরামের পোলাপানের মতোনই মনে হইতাছে।

তার মানে কী? আমরা এ দেশের মানুষ। বাংলার মানুষ। বাংলায় কথা বলি।

জে।

আর মিলিটারিরা?

তারা তো হুনছি অন্য ভাষায় কথা কয়। অন্য দেশের মানুষ।

হ্যাঁ, তারা অন্য দেশের মানুষ। সেই থেকে এসে দখল করতে চাইছে এই দেশ।

জে?

হ্যাঁ। তবে এসবের ভেতর অনেক কথা আছে, অনেক প্যাঁচ আছে। অতসব তুমি বুঝবে না। খুব সহজ কথায় তোমাকে দু-একটি ব্যাপার বোঝাই। ধরো তুমি একটা জমির মালিক। চাষবাস করে তুমি তাতে ফসল ফলাও। ফসল পাকলে অন্য গ্রামের কিছু লোক এসে ফসলটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তুমি তখন কী করবে?

নিজামের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল। জান থাকতে ফসল নিতে দিমু মনে করেন? মইরা যামু, তাও ফসল নিতে দিমু না।

মিলিটারিরা হচ্ছে ওরকম কিছু শয়তান। অন্য দেশ থেকে এসে আমাদের দেশের সব সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের লোকজন মেরে শেষ করে দিচ্ছে। আমাদের মা-বোনদের সর্বনাশ করছে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি আমরা। এ দেশ থেকে ওই শয়তানদের তাড়াব আমরা। দেশ স্বাধীন করব।

চোখে পট পট করে কয়েকটি পলক ফেলল নিজাম। কন কী! মেলেটারিরা এই রকম? চেরমেন শালায় তো তাইলে আমারে উল্টাপাল্টা বুঝাইছে।

হ্যাঁ। এখন রজাকার জিনিসটি কী তোমাকে আমি বোঝাই। এ দেশের যেসব শয়তান টাকার লোভে, ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে মিলিটারিদের পক্ষে কাজ করছে, তারা হলো রাজাকার।

তাইলে তো রজাকারও দেশের শত্রু। বেইমান। বদ।

হ্যাঁ।

হায় হায়, কিছু না বুইজা, পেটের দায়ে এইডা কী করছি আমি? রজাকার হইছি কেন? আমার মতোন বেইমান তো তাইলে কেউ নাই?

তুমি ভুল করেছ।

এমন ভুল মাইনষের করন উচিত না। দেশের লগে বেইমানি করন মানুষের কাম না।

বেইমানির শাস্তি কী হওয়া উচিত? রাজাকারদের শাস্তি কী হওয়া উচিত, এখন তুমিই বলো? তুমি মুক্তিযোদ্ধা হলে রাজাকারদের কী শাস্তি দিতে?

দাঁতে দাঁত চেপে নিজাম বলল, মাইরা ফালাইতাম। একদম মাইরা ফালাইতাম। এক শালা রাজাকাররেও বাঁচতে দিতাম না। দেশের মানুষ হইয়া দেশের লগে বেইমানি!

রফিক শীতল গম্ভীর গলায় বলল, তোমাকেও আমরা মেরে ফেলব। খালপাড় নিয়ে গুলি করে তোমার লাশ ফেলে দেব খালের জলে। তোমার লাশ দেখে অন্য রাজাকাররা যেন ভয় পায়। অন্য কেউ যেন রাজাকার হওয়ার সাহস না করে।

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিজাম। দৃঢ় গলায় বলল, তয় আর দেরি কইরেন না। তাড়াতাড়ি আমারে খালপাড় লইয়া যান।

১৯৯০

প্রবাসে এক বাঙালি

বিশাল হলরুমটির মাঝখানে পাশাপাশি দুটো লম্বা ধরনের টেবিল। টেবিল দুটো স্টিলের। একটি খালি পড়ে আছে, আর একটিতে আমরা দশ জন যুবক বেশ খানিকটা করে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি একমাত্র বাঙালি। একজন আছে শ্রীলঙ্কার। ওই যে সেই যুবক, যার সঙ্গে দেখা না হলে এই কাজ আমার কপালে জুটত না। চারজন আছে পাকিস্তানি, দুজন ইন্ডিয়ান। কেরলের ওদিককার। বেশ ভালো ইংরেজি বলে তারা। আর দুজন আছে ঘানার। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রং চকচকে কালো, যেন পিচ গলিয়ে অতিশয় যত্নে লেপে দেয়া হয়েছে তাদের সমস্ত শরীর।

টেবিলে দাঁড়াবার পর থেকেই বুকটা আমার ঢিব ঢিব করছে। কী কাজ, কী রকম কাজ কে জানে! আমার যা স্বাস্থ্য, এই কাজ আমি পারব তো?

হলরুমটির পুব দিকে কাচে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর একটি রুম। চমৎকার একটি টেবিল আছে রুমে, চমৎকার একটি রিভলভিং চেয়ার। মধ্যবয়সি, বেশ স্বাস্থ্যবান এক জার্মান ভদ্রলোক রিভলভিং চেয়ারে বসে টেবিলের ওপরে রাখা একটি ফাইল খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। নাকের ডগায় আছে তাঁর বেশ কায়দায় রিডিংগ্লাস।

পাকিস্তানি যুবক চারটি পাঞ্জাবি ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। একজন খুব হাসছে। আর সবাই বেশ চুপচাপ। ঘানার যুবকগুলো ভিতু চোখে একেকবার একেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

আমার বুকটা এমন করে কাঁপছে, গলা শুকিয়ে গেছে, ব্যাপারটা খেয়াল করল শ্রীলঙ্কার যুবকটি। সে খুবই প্রাণবন্ত ধরনের চটপটে যুবক। আমার

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কনুই দিয়ে মৃদু একটি গুঁতো দিল। ফিসফিস গলায় পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

ঢোক গিলে বললাম, আমার খুব নার্ভাস লাগছে।

কেন?

বুঝতে পারছি না।

কাজ করতে এসে নার্ভাস হওয়ার কী আছে! কাজ কাজই। এসো দুজনে কথাটথা বলি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একটু থেমে বলল, আসলে তোমার নার্ভাস হওয়ার কারণ কী জানো? তুমি একা। তোমার দেশের, তোমার ভাষার আর কেউ এখানে কাজ করছে না। তুমি কারো সঙ্গে তোমার মনোভাব শেয়ার করতে পারছ না।

আমার মতো অবস্থা তো তোমারও।

হ্যাঁ, আমিও একা। এখানে কোনো সিলোনিজ নেই। তবে আমার বিন্দুমাত্র খারাপ লাগছে না। কারণ আমি অনেক দিন জার্মানিতে আছি। অনেক জায়গায় কাজ করেছি। এসব ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত। এখানে আমরা দশ জন আছি, যে যে দেশেরই হই, কলিগ তো! দেখবে একসময় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। একজন অজান্তেই আরেকজনের আপন হয়ে গেছি।

কিন্তু পাকিস্তানিগুলোর সঙ্গে আমার হবে না।

কেন?

আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি পাকিস্তান নামের দেশটিকে। পাকিস্তানি লোক এবং তাদের সোলজারদের। উনিশ শো একাত্তর সালে ওরা আমাদের দেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। আমাদের তিরিশ লক্ষ লোক ওরা নির্বিচারে হত্যা করেছিল। ওদের সঙ্গে নয় মাস ঘোরতর যুদ্ধ করে আমরা আমাদের দেশ স্বাধীন করেছি। কী যে কষ্ট সাত কোটি বাঙালি করেছি, আমরা ছাড়া কেউ তা জানে না! আমি পাকিস্তান শব্দটি লিখে তার ওপর থুতু ছিটিয়ে দিই।

কথা বলতে বলতে কখন, কোন ফাঁকে শক্ত হয়ে গেছে আমার চোয়াল, বুকের ধুকপুকানি উধাও হয়ে গেছে, আমি তা টের পাইনি।

শ্রীলঙ্কার যুবকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। এই তো ঠিক হয়ে গেছ তুমি। এই তো পুরুষ মানুষের মতো হয়ে গেছ। আচ্ছা, একটা

ব্যাপার খেয়াল করেছ? এতক্ষণ ধরে কথা বলছি আমরা, কিন্তু কেউ কারো নাম জানি না।

তাই তো!

সঙ্গে সঙ্গে যুবক আমার দিকে হাত বাড়াল। আমার নাম সিংগাম।

আমি সিংগামের হাত ধরে বললাম, আমি স্বপন।

সিংগাম বলল, সিংগাম শব্দের মানে হচ্ছে সিংহ।

আমি আমার নামের মানে বললাম। শুনে সিংগাম মৃদু হাসল। একজন সিংহ, আরেকজন স্বপ্ন। দুজন দুই ভুবনের।

সিংগামের চেহারাও অনেকটা ঘানার যুবকদের মতো। গায়ের রং তীব্র কালো। লম্বায় আমার মতো। মাথার চুল কোঁকড়ানো। দাঁতগুলো উঁচু। অসম্ভব আন্তরিক যুবক।

আমরা কথা বলছি, কাচঘেরা রুম থেকে বেরিয়ে এলেন জার্মান ভদ্রলোক। আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এখন আর চোখে চশমা নেই।

এমনিতেই রাগী-গম্ভীর ধরনের মুখ তাঁর। সেই মুখ পাথরের মতো করে বললেন, গুটেন মরগেন (সুপ্রভাত)। আমার নাম হাইনরিশ হান। তোমাদের মাইস্টার, (মাস্টার, শিক্ষক, আমাদের কাজের তদারকি করবেন, বস অর্থে)। এসো, কাজ শুরু করা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই তটস্থ হয়ে উঠলাম। হানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হান বললেন, এখানে কী ধরনের কাজ করতে হবে, তোমরা মনে হয় তা পুরোপুরি জানো না। আমার কাছ থেকে শুনে নাও। প্রথমে শুনবে, পরে কেমন করে কাজটা করতে হবে, আমি হাতে-কলমে শিখিয়ে দেব। তবে শিখতে হবে ধাপে ধাপে, একেক দিন একেকটা করে আইটেম শিখবে। অনেক আইটেম আছে। এটা আসলে একটি মেটসিগারাই (কসাইখানা)। তোমরা হচ্ছ মেটসিগার (কসাই)। এখানে মাংসের কাজ-কারবার। তবে মাত্র দুই রকমের মাংস। গরু ও শূকর। প্রথমে তোমরা শিখবে শূকরের মাংসের কাজ। শূকরের শরীরের কোন জায়গার মাংস কেমন করে ছাড়াতে হয় ইত্যাদি। আস্ত শূকর তোমাদের কাছে আসবে না। এই কসাইখানার

একেক ডিপার্টমেন্টে একেক ধরনের কাজ হয়। প্রথমে হাজার হাজার জ্যান্ত শূকর আসে। সেগুলোকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মুহূর্তে শেষ করা হয়। মরা শূকর সেই ডিপার্টমেন্টেরই আরেকটা যন্ত্রে চড়িয়ে দেওয়া হয়। যন্ত্রের একদিক দিয়ে ঢুকে মরা শূকর অন্যদিক দিয়ে বের হয়। শরীর থেকে চামড়াটা সেই ফাঁকে উধাও হয়ে যায়। তারপর চামড়াহীন শূকরগুলো যায় আরেক ডিপার্টমেন্টে। সেখানে কসাইরা শূকরের মাথা একদিকে করে, হাত-পা একদিকে করে, পেট-সিনা একদিকে করে। তারপর একেকটা অংশ চলে যায় একেকটা ডিপার্টমেন্টে। কোনো ডিপার্টমেন্টে যায় শুধু রান, কোথাও পেট, কোথাও সিনা। তোমাদের মতো প্রাথমিক কসাইরা এসব অংশ নিয়ে কাজ করে। একেক রকম মাংসের একেক রকম প্যাকেট। প্যাকেট করার কাজগুলো মেয়েরা করে। গরুর ক্ষেত্রেও একই কারবার। আমরা কাজ শুরু করব শূকরের রান থেকে। তবে তার আগে আর একটি কাজ আছে। এই রুমের দুটো টেবিলের একটি তোমরা সবাই মিলে পাশের হলরুমটায় রেখে আসবে। সেখানে তোমাদের মতো আরেকটি গ্রুপ কাজ করবে। তারা কেউ বিদেশি নয়। সবাই জার্মান। এজন্য তাদের আলাদা রুমে দেয়া হলো। যদি বিদেশি হতো তাহলে এই রুমেই, তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েই কাজ করতে হতো তাদের।

হানের শেষ দিককার কথায় ভয়াবহ এক অহংকার টের পেলাম। আমাদের মতো একই কাজ করবে কিছু জার্মান যুবক। কিন্তু আমরা যেহেতু বিদেশি, তৃতীয় বিশ্বের হতদরিদ্র দেশের লোক, গায়ের রং যেহেতু কালো কিংবা রঙিন, সুতরাং আমাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ তারা করবে না। আমরা দশটি হতভাগ্য তাদের টেবিল পৌঁছে দেব।

গোপনে আমার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ধরাধরি করে টেবিলটা আমরা পাশের রুমে পৌঁছে দিই।

তারপর আমাদের নিয়ে নিজের রুমে ঢোকালেন হান। প্রত্যেককে একটি করে ট্রাউজার দিলেন, একই কাপড়ের ফুল হাতা একটি করে ফতুয়া, হাঁটু অবধি, উঁচু কালো রাবারের একজোড়া করে গামবুট আর হেলমেটের মতো একটি করে টুপি। এ হচ্ছে আমাদের কাজপোশাক। এই জিনিস পরে কাজ করতে হবে।

হলরুমের এক দিককার দেয়ালের সঙ্গে আছে সারধরা ছোট ছোট স্টিলের আলমারি। একেকজনকে একটি করে আলমারির চাবি দেয়া হলো। নম্বর লেখা চাবি। ঠিক ওরকম নম্বর আলমারিতেও লেখা আছে। যে যার নম্বরের আলমারি ব্যবহার করবে। কাজে এসেই আলমারি খুলে এই পোশাক পরতে হবে। নিজেরগুলো রাখতে হবে আলমারিতে। কাজ শেষ করে এগুলো খুলে রেখে আবার নিজেরগুলোতে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু কাজের ট্রাউজার, ফতুয়া, জুতো, টুপি এসব পরে যখন আলমারির গায়ে লাগানো আয়নার সামনে দাঁড়ালাম, নিজেকে আমি আর চিনতে পারি না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাওয়া আসামির মতো লাগছে নিজেকে।

পোশাকটা অবিকল ওই রকম।

আমার বুকটা হু হু করে ওঠে। চোখ দুটো ফেটে যেতে চায়। কে জানে, কার উদ্দেশে আমি মনে মনে বলি, কী অপরাধ আমার? কোন অপরাধের শাস্তি আমাকে দেয়া হয়েছে? আমি তৃতীয় বিশ্বের এক দরিদ্র দেশে জন্মেছি এই কি আমার অপরাধ? আমার টাকা নেই, এই কি আমার অপরাধ?

হান বললেন, আমি কিন্তু তোমাদের কাজে খুশি হতে পারছি না।

পাকিস্তানি একটি যুবকের নাম ইয়াকুব। সে বেশ চটপটে ধরনের। কাজও খুব ভালো করে। লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্য ভালো। কাজ করার সময় একদম কথা বলে না। একেবারে যন্ত্রের মতো।

হানের কথা শুনে আমরা সবাই হাতের কাজ থামিয়েছি। চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়েছি।

ইয়াকুব বলল, কেন খুশি হতে পারছ না?

হান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, তোমরা অত্যন্ত স্লো। এক সপ্তাহ হয়ে গেল এখনো শূকরের মাংসের কাজটি শিখে উঠতে পারলে না। অথচ এই কাজ শিখতে তিন দিনের বেশি সময় লাগার কথা নয়। তিন দিনে শিখে চার দিনের দিন থেকে স্পিড বাড়ানোর নিয়ম। অর্থাৎ কত দ্রুত, কতটা কাজ করতে পারছ। স্পিড বাড়ানো তো দূরের কথা, কাজটাই ভালো করে শিখতে পারছ না তোমরা। শূকরের হাড় থেকে মাংসটাই ভালো করে ছাড়াতে পারছ না! মাংসের টুকরোটাকরা হাড়ের গায়ে লেগে থাকে।

ইয়াকুব দৃঢ় গলায় বলল, এই অভিযোগ তুমি প্রত্যেককে করতে পারো না। আমরা যে কজন পাকিস্তানি আছি তাদের পারো না। আমার ধারণা, এই ব্যাচের মধ্যে আমরা চারজন সবচেয়ে ভালো কাজ করছি।

তা ঠিক, আমি তোমাদের কথা মেনে নিচ্ছি।

আমি একপলক ইয়াকুবের মুখের দিকে তাকাই। মেজাজটা কী যে খারাপ হয়! মনে মনে ইয়াকুবের চৌদ্দগুষ্টি তো বটেই, সমগ্র পাকিস্তান জাতিকে উদ্ধার করে ছাড়ি। কসাইয়ের কাজ তোরা ভালো পারবি না কেন রে শুয়োরের বাচ্চা? শুয়োরের হাড়-মাংস ছাড়াতে তোদেরই তো ভালো পারবার কথা। কারণ, ওদের সঙ্গে তোদের তো কোনো ব্যবধান নেই! শুয়োরেরাই শুয়োরদের মাংস ভালো কাটতে পারে!

হান বললেন, তোমাদের চারজনের ব্যাপারে আমার তেমন কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা পারবে। এখন যেটুকু গলদ আছে, ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের ব্যাচের একজনের ব্যাপারে সত্যিকার অর্থেই আমি হতাশ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। শালা কি আমার ব্যাপারে বলবে নাকি! আমার ব্যাপারে হতাশ হলে যদি চাকরি ছাড়িয়ে দেয়!

মায়ের চিঠিটার কথা মনে পড়ল। চাকরি চলে গেলে কী যে হবে!

নিঃশব্দে একটা ঢোক গিললাম, আড়চোখে সিংগামের দিকে তাকালাম।

ইয়াকুব বলল, কার ব্যাপারে হতাশ তুমি?

এখনি তার নাম বলতে চাইছি না। আরো একটি সপ্তাহ আমি তাকে দেখব। যদি ডেভেলপ করল তো করল, আর নয়তো...

কথা শেষ করল না হান। অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল।

আমাদের এই কারখানায় প্রত্যেকটি গ্রুপের একজন করে গ্রুপ ক্যাপ্টেন থাকে। গ্রুপ ক্যাপ্টেনের কাজ হচ্ছে নিজের গ্রুপের প্রত্যেকের কাজের তদারক করা। প্রত্যেকের কাজের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। এক সপ্তাহ পর পর ট্রেনারকে রিপোর্ট করা। আজ আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন বানাব। এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, প্রথম দিনই গ্রুপ ক্যাপ্টেন আমি কেন বানাইনি? বানাইনি এজন্য, আমি তখন জানি না তোমাদের গ্রুপের কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে, কে সবচেয়ে সিনসিয়ার। এই এক সপ্তাহে আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি।

কথা থামিয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাসলেন হান।

আমার বুকের ওপর একটি পাথর যেন চেপে বসেছিল এতক্ষণ, যখনি হান বলেছে কার ব্যাপারে সে সবচেয়ে হতাশ তার নাম এখনি বলবে না, পাথরটা তখন থেকেই একটু একটু নামতে শুরু করেছে। এখন প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ঘুরে গেছে দেখে পাথরটা একবারে নেমে গেল। চেপে চেপে আমি একটা হাঁপ ছাড়লাম। ঠিক তখনি হান বললেন, তোমাদের গ্রুপের সবচেয়ে কর্মঠ, সবচেয়ে সিনসিয়ার হচ্ছে ইয়াকুব। আমি ইয়াকুবকে তোমাদের গ্রুপ ক্যাপ্টেন করছি। আমার অনুপস্থিতিতে ইয়াকুব তোমাদের বস। তার কথা তোমাদের শুনতে হবে। বাথরুমে গেলে তার পারমিশন নিয়ে যেতে হবে। তার রিপোর্টের ওপর তোমাদের চাকরি নির্ভর করছে।

আমি আগেই অনুমান করেছিলাম, ইয়াকুবকে ক্যাপ্টেন করা হবে। তবু ব্যাপারটা যেন মেনে নিতে পারলাম না। একটি পাকিস্তানি হবে আমাদের গ্রুপের ক্যাপ্টেন? সেই শালার আন্ডারে কাজ করতে হবে? ওর রিপোর্টের ওপর চাকরি থাকা না-থাকা নির্ভর করবে? আমি যদি প্রতিবাদ করি? যদি বলি, এই ক্যাপ্টেনকে আমি মানি না। এ সঠিক ক্যাপ্টেন নয়। ইয়াকুবের চেয়ে অনেক ভালো কাজ করে সিংগাম। আমি সিংগামকে ক্যাপ্টেন করার প্রস্তাব করছি।

সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হারানোর কথা মনে হলো। আমার এসব বাড়াবাড়ি দেখে যদি চাকরি থেকে আজই ছাড়িয়ে দেয় হান?

আবার মা'র চিঠিটার কথা মনে হয়। তিন-চার মাস টাকা পাঠাই না দেশে। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। ঠিকমতো রেশন তোলা হচ্ছে না। বাজার হচ্ছে না।

কিন্তু নিজের এসব ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য একজন পাকিস্তানিকে ক্যাপ্টেন হিসেবে মেনে নেব? তার তাঁবেদার হয়ে কাজ করব? এই শুয়োরের বাচ্চারা উনিশ শো একাত্তর সালে...

ভাবনাটা পুরো শেষ হয় না। তার আগেই বুকের ভেতর অতিশয় তেজি এক বীর বাঙালি জেগে ওঠে আমার। হানের মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বললাম, আমি তোমার কথা মেনে নিতে পারছি না মিস্টার হান।

ইয়াকুবকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে দেখে চার পাকিস্তানির খুব ফুর্তি ফুর্তি ভাব। হাসি হাসি মুখ করে আছে তারা। ইয়াকুবের তো কথাই নেই, চাপা আনন্দে যেন ফেটে পড়ছে। আমার কথা শুনে এমন অবস্থা হলো ওদের, যেন আচমকা মুখে কেউ গায়ের যাবতীয় শক্তি একত্র করে লাথি মেরেছে। থতমত খেয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল ওরা। এমনকি পাকিস্তানি ছাড়া অন্য যারা আছে তারাও। হানও বেশ থতমত খেয়েছেন। ভুরু কুঁচকে খানিক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীর-শান্ত গলায় বললেন, কেন মেনে নিতে পারছ না?

আমার মনে হয় না শুধু ইয়াকুবই ভালো কাজ করে! আরো অনেকে করে।

যেমন?

আমি সিংগামকে দেখিয়ে বললাম, সিংগাম ভালো কাজ করে। ওকে ক্যাপ্টেন করো।

হান হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি তো চাইছিলাম তোমাকে ক্যাপ্টেন করতে। দুঃখিত, পারছি না। আরো দুঃখিত, যে নামটি আমি বলতে চাইনি, এখনি সেই নামটি আমায় বলতে হচ্ছে বলে। এই গ্রুপের মধ্যে তোমার ব্যাপারেই আমি সবচেয়ে বেশি হতাশ।

সঙ্গে সঙ্গে চার পাকিস্তানি প্রায় হানের মতোই শব্দ করে হেসে উঠল। হাত তুলে হান তাদের থামালেন। হেসো না।

তারপর আমার দিকে তাকালেন। আমি আর এক সপ্তাহ তোমাকে দেখব। ইয়াকুবের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করব।

তারপর হাতের এমন একটা ভঙ্গি করলেন, মানে হচ্ছে চাকরি নট। সেই ভঙ্গি দেখে আবার হাসল পাকিস্তানিরা।

আমার ভেতর তখন ছটফট করছে এক তেজি বাঙালি। ইচ্ছে করছে ঘুষি মেরে প্রথমেই ওই চার পাকিস্তানিকে ধরাশায়ী করি, তারপর ধরি হানকে। পাঁচটি শুয়োরের বাচ্চাকে দেখে নিই।

শরীরে রয়ে যায় শরীরের ক্রোধ। তবে গলার স্বর নরম হয় না। বলি, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি যদি ইয়াকুবের চেয়ে ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারি, তুমি কি আমাকে ক্যাপ্টেন করবে? তাহলে ব্যাপারটা এক সপ্তাহ বন্ধ রাখো। ক্যাপ্টেন যাকে করার তাকে এক সপ্তাহ পরে করো।

এবার হান গম্ভীর হলেন। থমথমে গলায় বললেন, তুমি খুবই বাড়াবাড়ি করছ। আমি যা করেছি তা-ই মেনে নিতে হবে তোমাকে। শুধু তোমাকেই নয়, সবাইকে। ইয়াকুবই তোমাদের ক্যাপ্টেন।

এবার আর হাসল না পাকিস্তানিরা। হানের থমথমে গলা সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

চলে যাওয়ার আগে হান বললেন, পাউজের (টিফিনে) পর তুমি, সিংগাম ও ইয়াকুব আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে। তোমাদের তিনজনকে দিয়ে আজ অন্য একটা কাজ করাব আমি। এই কাজটাও মাঝেমধ্যে করতে হবে তোমাদের।

কী কাজ?

আমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এখন যা করছি এর চেয়েও কঠিন কিছু? হানকে জিজ্ঞেস করব? না, ঠিক হবে না। এমনিতেই নানা রকমের বাড়াবাড়ি আজ হানের সঙ্গে আমি করেছি। কাজের জায়গায় এত কথা বলা, কোনো রকমের বাড়াবাড়ি জার্মানরা পছন্দ করে না। হান নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে আমার ওপর খুব রেগেছে। আজ তেমন কিছু বলেনি, তবে চান্স পেলে এই লোক আমাকে ছাড়বে না। দেখে নেবে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে আমি আবার শূকরের হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে থাকি।

লাঞ্চ সেরে আসার সঙ্গে সঙ্গে হান বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

ইয়াকুব ও সিংগাম দাঁড়িয়ে ছিল হানের পাশে। ইয়াকুব আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। কিন্তু সিংগাম আমার দিকে তাকাল না। আনমনা হয়ে আছে। চিন্তিত নাকি! কী ভাবছে?

লাঞ্চের পর থেকে আমি বেশ একটা ফুরফুরে মুডে আছি। লাঞ্চে সপ্তাহে এক দিন ভাত দেয়। এই দিনটির নাম দিয়েছি 'ভাত ডে'। ভাতের সঙ্গে আজ ছিল প্রায় বাঙালি কায়দার খাবার। কী একটা স্যুপ ছিল, একেবারেই পাতলা মসুর ডালের মতো। আর ছিল গরুর গোস্ত। এ দেশে গরুর গোস্তের অনেক দাম। তবু সপ্তাহে এক দিন দেয়। সব মিলিয়ে দুপুরের খাওয়াটা আজ দুর্দান্ত হয়েছে। ভাত খাওয়ার আগে এক বোতল বিয়ার খেয়েছিলাম। বিয়ারটা নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এক বোতলের দাম এক মার্ক। নগদ একটা মার্ক লাঞ্চের সঙ্গে ব্যয় করেছি।

আসলে হানের সঙ্গে এত কথা বলতে পেরে ভেতরে বেশ একটা আনন্দ হচ্ছিল। যাক, নিজের ভেতরকার ক্ষোভ পুরোটাই ঝেড়ে দেয়া গেছে।

হানের পিছু পিছু আমরা তিনজন তারপর বিশাল একটি হলরুমে এসে ঢুকলাম। রুমটায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গা কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। রুম নয় এ আসলে কোল্ডস্টোরেজ। শরীরের ভেতর শীতের কাঁপন লাগে। চারদিকে তাকিয়ে আমি রুমটা দেখতে লাগলাম। মাথার ওপর লম্বালম্বিভাবে ঝুলছে গোটা আস্টেক ভারী স্টিলের বিম। প্রত্যেক বিমের সঙ্গে ঝুলছে হুক। দশমণি বস্তা টাঙিয়ে রাখলেও হুকগুলোর কিছু হবে না। কিছু কিছু হুকের সঙ্গে অতিকায় গরুর রান, সিনা কিংবা দেহের অন্যান্য অংশ আটকানো। কোনোটির ওজনই দুই-আড়াই মণের কম হবে না।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখছি। হান বললেন, ওই যে চাকা লাগানো ট্রলিটা দেখছ, ওটা ঠেলে আনো।

আমি হানের মুখের দিকে তাকালাম। আমাকে বলছো?

হ্যাঁ।

আমি ট্রলিটার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। প্রায় মাইক্রোবাস সাইজের ট্রলি। এই ট্রলি একা একজন লোক কেমন করে ঠেলে আনবে?

বললাম, আমরা সবাই মিলে ঠেলে আনব?

হান হাসলেন। না, তুমি একা। তোমাকে একা ঠেলে আনতে হবে।

এত বড় ট্রলি কী করে একা ঠেলে আনব? এ তো অসম্ভব ব্যাপার!

অসম্ভব ব্যাপার নয়, ওই ট্রলিটা একজন লোকই ঠেলে আনে। চাকা লাগানো আছে। তুমি যাও, দেখো।

আমার বুকটা ধুকধুক করতে লাগল। খানিক আগে এত চমৎকার লাঞ্চ করেছি, এক বোতল বিয়ার খেয়েছি, মুহূর্তে সব যেন হজম হয়ে গেল।

ট্রলিটার কাছে এগিয়ে গেলাম। সামনে দাঁড়িয়ে ট্রলির ভেতর উঁকি মারলাম। হুকের সঙ্গে যেসব মাংসের চাঁই ঝুলছে ওসব চাঁইয়ে প্রায় ভর্তি ট্রলিটা, চল্লিশ-পঞ্চাশ মণের কম হবে না।

পেছন থেকে শরীরের যাবতীয় শক্তি একত্র করে ট্রলিতে ধাক্কা দিলাম। শরীরের ভিতরটা চড়চড় করে উঠল কিন্তু একচুলও নড়ল না ট্রলি। হান ও

ইয়াকুব হো হো, হা হা করে হেসে উঠল। কিন্তু সিংগাম একবারে স্তব্ধ হয়ে আছে, গম্ভীর হয়ে আছে। কী রকম মুখ-চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি আবার ধাক্কা দিলাম। আবার। আবার। কিন্তু ট্রলি নড়ে না। কোল্ডস্টোরেজে দাঁড়িয়েও টের পেলাম জামাকাপড়ের তলায় ঘামে শরীর একেবারেই ভিজে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পিপাসা পেয়েছে। কিন্তু পানির কথা বললে হান ও ইয়াকুব আবার হাসবে।

হানের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বললাম, দুঃখিত মিস্টার হান। আমি পারছি না।

হান গম্ভীর হলেন। এটা এমন কোনো ভারী কাজ নয়। এ কাজ না পারলে ক্যাপ্টেন হওয়া তো দূরের কথা, এখানে কাজ করারই যোগ্য নও তুমি।

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হান বললেন, চলে এসো।

তারপর সিংগামের দিকে তাকালাম। তুমি যাও, ট্রলি ঠেলে আনো।

সিংগাম গম্ভীর গলায় বলল, আমি পারব না।

হান তো বটেই, আমি ও ইয়াকুবও চমকালাম। তিনজন মানুষ একসঙ্গে তাকালাম সিংগামের মুখের দিকে।

হান বললেন, এখানে কাজ করতে হলে এটা পারতে হবে।

সিংগাম কোনো কথা বলল না। আগের মতোই গম্ভীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আড়চোখে সিংগামের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি অদ্ভুত এক ক্ষোভ এবং রাগে সিংগামের কালো মিষ্টি মুখ ফেটে পড়ছে। মুখ বন্ধ করে কোনো কিছু চিবালে দুই জুলফির কাছটা যেমন ওঠা-নামা করে, তেমন করছে।

হান বললেন, ইয়াকুব, তুমি যাও।

সঙ্গে সঙ্গে অনুগত কুকুরের মতো ছুটে গেল ইয়াকুব। বড় করে শ্বাস টেনে বুকের ভেতর হাওয়া আটকাল এবং দুহাতে দৈত্যের ভঙ্গিতে ঠেলা দিল ট্রলিতে। ঘড়ঘড় শব্দে চলতে শুরু করল ট্রলি।

হান মুগ্ধ চোখে ইয়াকুবকে দেখলেন তারপর আমাদের দিকে তাকালেন। দেখলে, একজন লোকে এই ট্রলি ঠেলে আনতে পারে কি পারে না? ইয়াকুবকে আমি কেন ক্যাপ্টেন করেছি বুঝেছ?

আমি ও সিংগাম মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কোনো কথা বললাম না।

ট্রলিটা হানের পায়ের কাছে এনে দাঁড় করাল ইয়াকুব। মুখ উদ্ভাসিত করে হাসল।

হান বললেন, ডাংকেসুন (ধন্যবাদ) ইয়াকুব। এবার দ্বিতীয় কাজটা করো। ট্রলি থেকে মাংসের একটা চাঁই তুলে ওই হুকে আটকে দাও।

ওরকম একটা ট্রলি ঠেলে এনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই সাইজের একটা মাংসের চাঁই শূন্যে তুলে হুকে আটকানো, এ কি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব?

কিন্তু ইয়াকুব অবলীলায় কাজটা করে ফেলে। যেন কোনো কিছুই গায়ে লাগছে না তার–এমন ভঙ্গিতে দুহাতে বুকের কাছে চেপে ধরল দুই-আড়াই মণ ওজনের একটা মাংসের চাঁই। একদমই হাছড়পাছড় করল না, যেন ছোট্ট একটি শিশু কোলে নিয়েছে–এমন ভঙ্গিতে হুকের সঙ্গে মাংসের চাঁইটা আটকে দিল।

হান আনন্দিত গলায় বললেন, গুট (গুড)।

তারপর সিংগামের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে গেলাম আমি। যাক আমি বেঁচে গেলাম। ট্রলি ঠেলে আনতে পারিনি দেখে হান বুঝে গেছে এটাও আমি পারব না, এজন্য আমার দিকে তাকাচ্ছে না।

সিংগাম আলতো করে হানের দিকে মুখ ফেরাল। হান কথা বলার আগেই শীতল গলায় বলল, আমি পারব না।

এবারও আগের মতোই অবাক হলো হান। তাহলে কী করে হবে?

হবে না।

তার মানে তুমি এখানে কাজ করতে চাইছ না?

আমাকে ভাবতে হবে।

হান আর কথা বললেন না। আমার দিকে তাকালেন। এবার তুমি।

জি!

উত্তেজনায়, আতঙ্কে বাংলা শব্দ বলে ফেললাম আমি। ইয়াকুব বোধহয় শব্দটা বুঝল। নিঃশব্দে হাসল।

হান বললেন, দেরি করছ কেন?

আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। দু-তিনটা ঢোক গিলি। আমিও কি সিংগামের মতো সরাসরি বলে দেব, পারব না!

কিন্তু দেশ, টাকা! মা-বাবা ভাইবোন!

আমি ট্রলির দিকে ঝুঁকে গেলাম।

কিন্তু অবিরাম হাছড়পাছড় করে মাংসের একটা চাঁই ট্রলি থেকেই তুলতে পারি না আমি। চেষ্টা করি, চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত অতিকষ্টে ধরি একখণ্ড মাংস, কোনো রকমে সোজা হয়ে দাঁড়াই। বুকের ভেতর আটকে রেখেছি শ্বাস। শ্বাস ছেড়ে দিলেই মাংসখণ্ড পড়ে যাবে বুক থেকে।

কিন্তু আমার শ্বাস ফুরিয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে রাখার ফলে শরীরের যাবতীয় রক্ত উঠে এসেছে মুখে। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। তীব্র চাপে চুলের গোড়া ফুটো করে বেরিয়ে আসছে ঘাম।

আমি পারি না, আমি পারি না। আমার বুক ফেটে যায়, মুখ ফেটে যায়। শ্বাস ফুরিয়ে আসে। মাত্র দু-তিন পা ফেলেই মাংসখণ্ড নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। মাংসখণ্ড পড়ে মেঝেতে, আর আমার মুখ মাংসখণ্ডের ওপর। ফলে পরিবেশ ভুলে যাই। ওই তো কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে হান, ইয়াকুব আর সিংগাম। আমার কারো কথা মনে পড়ে না। বুক ঠেলে ওঠে তীব্র এক কান্না। গরুর মাংসে মুখ গুঁজে অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে থাকি আমি। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, তার পরই নিজের ভেতর এক বীর বাঙালিকে জেগে উঠতে দেখি। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াই। না, এই কাজ আমার নয়। এই কাজ আমি করব না। দেশে দরকার হলে ধার করে টাকা পাঠাব। ধার না পেলে পাঠাব না। আমার মা-বাবা, ভাইবোন কিছুদিন না হয় কষ্ট করে চলবে। এক-দু মাসের মধ্যে নিশ্চয় অন্য কাজ পেয়ে যাব। তখন ওভারটাইম করে না হয় এখনকার ঘাটতি মেটাব। একসঙ্গে অনেক টাকা পাঠাব দেশে।

এসব যখন ভাবছি, কথা বলার কথা হানের, কিন্তু কোনো কথা বললেন না, বলল ইয়াকুব। তুমি হতে চাও ক্যাপ্টেন? তোমার গায়ে তো শক্তিই নেই!

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত লাফিয়ে ওঠে মাথায়। ডান হাতে চলে আসে শরীরের সব শক্তি। দিকপাশ না ভেবে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারি ইয়াকুবের মুখে। শক্তি আছে কি নেই, দেখ শুয়োরের বাচ্চা!

১৯৮৩

রতন মৃধার বাংলাদেশ

তোমার নাম কী?

রতন। রতন মৃধা।

বাড়ি কোথায়? মানে কোন গ্রামে?

বাড়ি তো আছিলো সাহেব কনকসার। এখন আর নাই। পদ্মায় ভাইঙ্গা নিছে।

এখন তাহলে থাকো কোথায়?

থাকি সাহেব পথের ধারে। কুমারভোগ চৌরাস্তা থেকে লৌহজংয়ের দিকে গেছে যেই রাস্তা সেই রাস্তার পাশে ছাপরা উঠাইছি। আমার মতন বহুত নদীভাঙা মানুষ ওইরকম ছাপরা উঠাইছে রাস্তার ধারে। ওইভাবেই থাকি।

লৌহজং এলাকাটা প্রতিবছরই ভাঙছে। গত বছর উপজেলা ভবনটবন সব চলে গেছে নদীতে। এদিককার কত বিখ্যাত গ্রাম যে এখন আর নেই! এভাবে ভাঙতে থাকলে বিক্রমপুর অঞ্চলটাই একসময় বিলীন হয়ে যাবে। নদী ভাঙার ফলে আদি বিক্রমপুরের অর্ধেকটাই নেই। যেটুকু আছে সেটুকুও বুঝি যায় যায়।

আপনি সাহেব যাবেন কোন দিকে?

রতনের কথাটা শুনেও শুনতে পাই না আমি। সে তার মতো করে রিকশা চালাচ্ছে, আমি আছি উদাস হয়ে। আসলে কোনদিকে যে যাব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বিকেলের মুখে মুখে মুনিরদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। মুনির ছিল সঙ্গে। সে আমার মামাতো ভাই। অল্প বয়েসি ছেলে। আমাকে ডাকে দাদা। অত্যন্ত প্রাণবন্ত, কর্মঠ ছেলে। আলস্য কাকে বলে জানে না। রাতদুপুরেও যদি কোনো কিছুর দরকার হয়, কিচ্ছু না ভেবে, কারো সাহায্য না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। সেই জিনিস জোগাড় করে আনবে।

আজ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুনির বলল, চলেন দাদা, বাজারের দিকে যাই। আড্ডা দিয়াসি।

বাজারের দিকে যেতে আমার ইচ্ছে করছিল না। মাওয়ায় এখন কি আর সেই ছোট্ট নির্জন বাজার আছে! মাওয়া এখন বিশাল গঞ্জ এলাকা। আধা শহর বললেও ভুল হবে না। ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক হওয়ার ফলে মাওয়া এখন দেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। লোকের মাথা লোকে খায়, এমন ভিড় শুধু দিনদুপুরে না, রাতদুপুরেও।

আমি গ্রামে এসেছি নিরিবিলিতে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্য। ঢাকা শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে একটুখানি নির্বাসন, একটুখানি একা, নিজের মতো করে কয়েকটা দিন কাটানো। এই অবস্থায় বাজারের লোকজন, হইহল্লা ভালো লাগবে না। ভালো লাগবে একা একা ঘুরে বেড়াতে। নির্জন নদীতীরে গিয়ে যদি একটু বসে থাকা যায়! রিকশা নিয়ে সারাটা বিকেল যদি একটু ঘুরে বেড়ানো যায়! কোথাও পথের ধারে টংঘরের চায়ের দোকান পেলে সেখানে দাঁড়িয়ে যদি এক কাপ চা খাওয়া যায়! আমি আসলে এরকম চাইছি।

মুনিরকে বললাম কথাটা।

শুনে বলল, নির্জন নদীতীর এইদিকে পাইবেন না দাদা। চারদিকে খালি মানুষ। ঢাকা থেকে বিকালবেলা বেড়াইতে চইলা আসে লোকে। তারচে' আপনে রিকশা লইয়া ঘুইরা বেড়ান। রাস্তায় চলেন, রিকশা ঠিক কইরা দিতাছি।

এই রিকশা মুনিরই ঠিক করে দিয়েছিল। মাওয়ার দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে রিকশা চালাতে বলেছিলাম আমি, কথা বলতে শুরু করেছিলাম রতনের সঙ্গে। সীতারামপুরের দিকটায় এসে রতন জানতে চেয়েছে আমি কোন দিকে যাব?

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, যাও তোমার যেদিকে ইচ্ছা। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরবা। তারপর যেখান থেকে উঠেছি সেখানে নামিয়ে দিয়ো।

আইচ্ছা।

রতন কাজির পাগলার দিকে রিকশা চালাতে শুরু করেছে।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে এই এলাকায়। মেদিনীমণ্ডলে নানাবাড়িতে থাকতাম, পড়তাম কাজির পাগলা হাইস্কুলে। তখনকার সেই নিঝুম নির্জন

গ্রামগুলোর সঙ্গে আজকের এইসব গ্রামের কোনো মিল নেই। খাল ডোবা নালা ভরে সুন্দর রাস্তা হয়েছে। বিক্রমপুরের ঐতিহ্য টিনের ঘরদোর আছে কিছু, তবে অনেক বাড়িতেই সুন্দর সুন্দর দালানকোঠা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের যে এলাকার মানুষ সবচাইতে বেশি টাকা-পয়সার মালিক হয়েছে সেই এলাকার নাম বিক্রমপুর। যদিও সরকারি নথিপত্রে বিক্রমপুর নামটাই এখন আর নেই, বহু বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন বিক্রমপুর আছে মানুষের মুখে মুখে। বিক্রমপুরের লোক শুনলেই লোকে মনে করে টাকাওয়ালা লোক। বিক্রমপুরে কোনো গরিব মানুষ নেই।

কথাটা পুরোপুরি সত্য না। বিক্রমপুরে গরিব মানুষও আছে। পরিমাণে কম, কিন্তু আছে। এই যে রতন রিকশাওয়ালা সে তো আসলে গরিব মানুষই! হয়তো একসময় সচ্ছল ছিল, নদীর ভাঙনে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় কাজির পাগলা বাজারটি বেশ জমজমাট ছিল। আমির খাঁর মুদি-মনিহারি দোকান, জলধর ডাক্তারের ডিসপেন্সারি, গান্ধি ঘোষের মিষ্টির দোকান। পশ্চিম দিক দিয়ে বাজারে ঢোকার মুখে ছিল করিম ডাক্তারের ডিসপেন্সারি। একটা চন্দন গোটার গাছ ছিল, খালের দিকে ঝুঁকে ছিল এক জোড়া বউন্নাগাছ। এখন সেসব গাছের জায়গায় দু-তিনটা আমগাছ, একটা জামগাছ। জামগাছটার তলায় চায়ের দোকান দিয়ে বসেছে একলোক। আমি যে ধরনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার কথা ভেবেছিলাম, দোকানটা ঠিক তেমন। কিন্তু কোনো কাস্টমার নেই। চুলার সামনে বসে সিগ্রেট টানছে দোকানি।

রতনকে বললাম, রিকশা রাখো। আমি এককাপ চা খাব।

দোকান পর্যন্ত রিকশা গেল না। একটুখানি জায়গা ভাঙা। রতন রিকশা দাঁড় করাল একটু দূরে। আমি নেমে গিয়ে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। নিজে এককাপ চা নিয়ে দোকানিকে বললাম রতনকেও এক কাপ চা দিয়ে আসতে। দোকানি বলল, লাভ নাই সাহেব। রতন আপনের চা খাইব না।

কেন?

ও কেউর দেওয়া কোনো জিনিস নেয় না, কেউর দেওয়া কোনো জিনিস খায় না।

কথাটা বুঝতে পারি না। চায়ে চুমুক দিয়ে দোকানির দিকে তাকিয়ে থাকি। আপনি চেনেন রতনকে?

জি সাহেব। ভালো কইরাই চিনি। দ্যাশ-গেরামে সবাই সবাইরে চিনে।

কিন্তু রতন তো এই এলাকার লোক না!

না হইলেও রতনরে দশ-বিশ গ্রামের সবাই চিনে। ও খুব নাম করা মানুষ। বিরাট মুক্তিযোদ্ধা আছিল। গোয়ালিমান্দ্রার যুদ্ধে রতন একলাই বিশ-তিরিশ জন পাকসেনা খতম করছিল।

শুনে আমি হতভম্ব। আমার গলা দিয়ে চা নামতে চায় না, গলা যেন বন্ধ হয়ে গেছে। বলে কী! রতন ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেশ স্বাধীন করেছিল! আর আজ সে রিকশাওয়ালা! এ কী করে সম্ভব!

পেটের দায়ে কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা মানবেতর জীবনযাপন করে, রিকশা চালায় কেউ, ফেরিওয়ালা হয়েছে কেউ এই ধরনের খবর হঠাৎ হঠাৎ পত্রপত্রিকায় আসে। আজ সেই রকম একজন মানুষ আমার সঙ্গে! তার রিকশায় চড়ে হাওয়া খাচ্ছি আমি! আমার খুব অপরাধবোধ হয়।

দোকানি বলল, রতন যে মুক্তিযোদ্ধা আছিল এই কথা ও সহজে কেউরে কয় না। ও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেয় নাই। অস্ত্র জমা দেওনের পর সাধারণ মানুষ হইয়া গেছে। সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধাও নেয় নাই। কোনোরকমের সাহায্য সহযোগিতা নেয় নাই কেউর থিকা।

কেন?

তা জানি না। তয় খুবই সৎমানুষ রতন। নিজে রিকশা চালাইয়া খায়, অসুখবিসুখ হইলে রিকশা চালাইতে পারে না, বাড়িতে কোনো কোনোদিন রান্ধন হয় না, তাও কেউর কাছে হাত পাতব না। সাহায্য তো দূরের কথা ধার উধারও নিব না কেউর কাছ থিকা। স্বভাবটা আজব পদের। নিজের কথা কেউরে কইতেও চায় না। লেখাপড়া জানে না রতন, তয় জ্ঞানবুদ্ধি বহুত ভালো। কথাবার্তা কইলে ভালোই কয়।

সংসারে আছে কে কে?

পোলাপান নাই রতনের। ও হইল নিঃসন্তান। বউটা হাঁপানির রোগী। বচ্ছরে নয় মাসই বিছানায় থাকে। সারা দিন রিকশা চালাইয়া বাড়িত ফিরা

রতন আবার রান্ধনবাড়ন করে। বউরে খাওয়াইয়াও দেয়। অবস্থা একসময় ভালোই আছিল। নদীর ভাঙনে গরিব হইয়া গেছে। রতনের ভাইবইন আত্মীয়স্বজন অনেকেই আছে ভালো অবস্থার। রতন কেউর কাছে যায় না। এখন তারাও কেউ আর রতনের কাছে আসে না। রতনের খোঁজখবর লয় না।

রতনের কথা শুনতে শুনতে পর পর দুকাপ চা খেয়েছি আমি। তারপর রতনের রিকশার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কপালের ফেরে একজন মুক্তিযোদ্ধা আজ রিকশাওয়ালা এ কথা জানার পর কিছুতেই তার রিকশায় আমি চড়তে পারব না। তাকে আর তুমি করে বলতে পারব না।

আমার ইচ্ছে করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করি রতনকে। দোকানি বলেছে নিজের কথা বলতেই চায় না রতন। কিন্তু আমাকে তো কয়েকটা কথা বলেছে! নামধাম, গ্রাম-পরিচয়। জিজ্ঞেস করলে কি আর দু-একটা বলবে না?

আমি রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে আছি দেখে রতন বলল, খাড়াইয়া রইলেন ক্যান সাহেব? রিকশায় ওঠেন। চলেন যাই। বিকাল শেষ হইয়া গেছে।

আমার যে ভাই এখন আপনার রিকশায় উঠতে ইচ্ছে করছে না।

আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল রতন। তারপর হাসল। মোস্তফা তাইলে আমার কথা আপনেরে বইলা ফালাইছে!

মোস্তফা কে?

ওই চায়ের দোকানদার। আমারে চিনে।

আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা... ...

রতন হাত তুলে আমাকে থামাল। তাতে কী হইছে? একাত্তর সালে পাকিস্তানিগ পক্ষের কিছু লোক ছাড়া বেবাকতেই তো মুক্তিযোদ্ধা আছিল! আমি নাহয় অস্ত্র হাতে লইয়া যুদ্ধ করছি। যারা অস্ত্র হাতে লয় নাই বা লইতে পারে নাই, মনে-প্রাণে দেশের স্বাধীনতা চাইছে তারাও তো মুক্তিযোদ্ধা। সেই অর্থে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বেশিরভাগ মানুষই মুক্তিযোদ্ধা। এইডা লইয়া একলা আমি বড়াই করুম ক্যান?

শুনে আমার মুখে কথা জোটে না। অপলক চোখে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

রতন বলল, আমি লেখাপড়া জানি না। ভালো কাম কাইজ শিখি নাই। নদীভাঙনের আগে গিরস্তালি করছি। জমাজমি আছিল, ধানপাট চাষ করছি। এখন জমাজমি নাই এই জইন্য রিকশা চালাই। আমার মনে সাহেব কোনো দুঃখ নাই। বেদম একটা সুখ আছে। আমি রিকশা চালাই আমার নিজের দেশে। বাংলাদেশে। নিজের হাত দিয়া এই দেশ স্বাধীন করছি। স্বাধীন কইরা নিজের ইচ্ছা মতন রিকশা চালাই। আমার মতন সুখী কে আছে কন? ওঠেন, রিকশায় ওঠেন।

রতনের কথা শুনে আমার বুকটা তোলপাড় করে। এইসব মহান মানুষ ছিল বলেই দেশটা আমাদের স্বাধীন হয়েছে, এইসব মহান মানুষ আছে বলেই দেশটা আমাদের টিকে আছে, এগিয়ে যাচ্ছে।

আমার ইচ্ছে করে রতনকে বলি, ভাই, আপনি রিকশায় বসুন। আমি আজ চালিয়ে নিই রিকশা। আপনাকে পৌঁছে দিই আপনার গন্তব্যে। তাতে আমার এ জীবন ধন্য হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছোট ছিলাম, যুদ্ধ করতে পারিনি। আজ একজন মুক্তিযোদ্ধাকে রিকশায় বসিয়ে সেই রিকশা চালিয়ে নিতে পারলে দেশের মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। আপনি আমাকে সেই সুযোগটা দিন। দেশের প্রতি আমার ঋণ কিছুটা শোধ করার সুযোগ দিন। আমার জীবন ধন্য করুন।

২০০১

সাড়ে তিন হাত ভূমি

স্টেজ থেকে নেমে অফিসরুমের দিকে যাচ্ছি, ভিড় ঠেলে ছেলেটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। স্যার, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

হেডমাস্টার সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, এখন যাও, পরে আসো। স্যার এখন টায়ার্ড।

আমার চারপাশে টিচাররা প্রায় সবাই আছেন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আছেন। স্কুলের মাঠে সাত-আট শো ছেলেমেয়ে হইচই করছে। ঘণ্টা খানেক আগে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিটি উদ্বোধন করেছি আমি। তারপর স্টেজে গিয়ে বসেছি।

এই ধরনের অনুষ্ঠানে বক্তার অভাব থাকে না। জুন মাসের গরমেও সুট-টাই পরে বক্তৃতা দিতে চলে এসেছেন এখানকার কেউকেটারা। মাইক হাতে নেওয়ার পর কী তেজ একেকজনের! ভুল উদাহরণে অতিশয় জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে। এত বিরক্তিকর সেইসব বক্তৃতা, শুনে চড় মারতে ইচ্ছা করে। তার তো আর উপায় নেই, বরং এদিক ওদিক মুখ করে উল্টো বলতে হয়, দারুণ বলেছেন ভাই। ভেরি ওয়েল সেইড।

ঘণ্টাখানেক ওই জিনিস হজম করে, নিজের সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শেষ করে, গরমে ঘামে অস্থির হয়ে স্টেজ থেকে নেমেছি। এখন এক কাপ চা খেলে ক্লান্তি কাটবে। ওদিকে স্টেজে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। মাইক্রোফোন টেস্ট করছে কেউ। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি। হাতুড়ি নিয়ে তবলার বাঁধ ঠিক করছে তবলচি আর চাটি মেরে

মেরে দেখছে বাঁধ জুতমতো হয়েছে কি না! ভাবখানা এইরকম, যেন বাজাতে বাজাতে তবলা আজ সে ফাটিয়ে ফেলবে। দুটো মেয়ে ঝলমলে নাচের পোশাক পরে, মুখে কড়া মেকআপ নিয়ে স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের চাউনি আর ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে ওদের মতো নৃত্যশিল্পী বাংলাদেশে আর একজনও নেই।

এই ধরনের অনুষ্ঠানে গেলে অনেক ধরনের যন্ত্রণা পোহাতে হয়। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই আমার নাটকে অভিনয়ের বাসনা প্রকাশ করে। টেলিভিশনে কীভাবে ঢোকা যায়, সেসব জানতে চায়। কেউ কেউ নিজের লেখা গল্প কবিতা দেখাতে চায়। আর মোবাইল নাম্বার চেয়ে তিতিবিরক্ত করে ফেলে। এই ছেলেটিও নিশ্চয় সেই ধরনের কোনো বিষয় নিয়েই কথা বলতে চায়। ভালো হয়েছে হেডমাস্টার সাহেব তাকে একটা ধমক দিয়েছেন।

অফিসরুমে আমাকে বসতে দেয়া হলো হেডমাস্টার সাহেবের চেয়ারে। পাশে একখানা মুভিং স্ট্যান্ডফ্যান ঘুরছে ভোঁ ভোঁ করে। লোকজন যে যার চেয়ার টেনে বসে পড়েছেন। সামনের টেবিলভর্তি খাবার। ছোট সাইজের আপেল টুকরো টুকরো করে কেটে ডাঁই করা হয়েছে প্লেটে। খোসা ছাড়ানো কমলারও একই দশা। শবরিকলা আছে, কেক-বিস্কুট আছে। আর আছে গ্লাসভরা কোক, ছোট ছোট মিনারেল ওয়াটারের বোতল। দুটো টিস্যু পেপারের বক্সও আছে। মোটকথা এলাহি কাণ্ড!

এইসব খাবারের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার। আমি চাইছি এক কাপ চা। লেবু চা হলে ভালো হয়।

বললামও কথাটা।

হেডমাস্টার সাহেব বিনয়ের অবতার হয়ে বললেন, আগে এসব একটু মুখে দেন স্যার। লেবু চা আসবে।

চা এল পাঁচ সাত মিনিট পর। মাত্র চুমুক দিয়েছি, সেই ছেলেটি এসে দাঁড়াল অফিসরুমের দরজায়। আমার দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, স্যার...

হেডমাস্টার সাহেব আবার তাকে একটা ধমক দিলেন। তোমাকে না বললাম...

এই প্রথম ছেলেটির দিকে তাকালাম আমি। তাকিয়ে বেশ একটা ধাক্কা খেলাম। চেহারাটা কেমন পরিচিত। আমার চেনা কার সঙ্গে যেন এই চেহারার খুব মিল। কার সঙ্গে, ঠিক মনে করতে পারছি না।

ছেলেটি তখনো দাঁড়িয়ে আছে। হেডমাস্টার সাহেব হয়তো আবার তাকে ধমক দেবেন, তার আগেই আমি বললাম, এসো, ভেতরে এসো। বলো কী বলবে।

আমি মনে মনে খুঁজছি কার সঙ্গে ওর চেহারার মিল। কার সঙ্গে!

ছেলেটি ভেতরে ঢুকে বলল, স্যার, আমার বাবার নাম মতি। মতি মাস্টার। আপনি তারে চিনেন।

সঙ্গে সঙ্গে মতি মাস্টারের কথা মনে পড়ল আমার। সত্তর সালে আমাদের গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে লজিং থেকে জগন্নাথ কলেজে বিএ পড়তেন। অতি অমায়িক সজ্জন মানুষ। লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। পড়াতেন যেমন ভালো, দেখতেও ছিলেন তেমন ভালো। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি। আমাকেও ভালোই পড়াতেন। তবে অঙ্কটা তেমন জানতেন না। অন্যান্য সাবজেক্ট ভালো পড়াতেন। বিশেষ করে বাংলা। এই ছেলেটির মুখখানি যেন হুবহু সেই সময়কার মতি মাস্টার। কিন্তু তিনি যে এই এলাকার লোক তা তো আমার জানা ছিল না। তা ছাড়া স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর কেটে গেছে মতি মাস্টারের সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেই আমাদের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। শুনেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হয়নি। এই ছেলেটিকে দেখে আমি সেই সময়কার মতি স্যারের কাছে ফিরে গেলাম। স্মৃতিকাতর গলায় বললাম, তুমি মতি স্যারের ছেলে! কী নাম তোমার?

মিজান।

আমার কথা কি তোমার বাবা বলেছেন?

জি। বলেছিলেন, ওকে তো আমি কিছুদিন পড়িয়েছি। সে কথা মনে আছে কি না কে জানে? তুই গিয়ে আমার পরিচয় দিস।

আমার মনে আছে। সব মনে আছে। স্যার আছেন কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে মিজানের মুখ কেমন দুঃখী হয়ে গেল। সে কথা বলবার আগেই ম্যানেজিং কমিটির লিয়াকত সাহেব বললেন, না, মতি ভাই ভালো নাই। তার ক্যানসার হইছে। লিভার ক্যানসার।

শুনে আমি একেবারে নিভে গেলাম।

মিজান বলল, আপনি এই স্কুলে আসছেন শুনে বাবা বললেন, পারলে আমি যেন আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়া যাই। আপনাকে দেখতে চাইলেন।

আমি যাব, অবশ্যই যাব।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আমরাও যাই স্যার আপনার সঙ্গে। বেশি দূর তো না। মতি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এসে এখানে খাওয়াদাওয়া করবেন, গাড়ি তো থাকবেই, তারপর এখান থেকে চলে যাবেন।

ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান বকর সাহেব বললেন, আমার গাড়িটা নিয়ে যান।

মিজান বলল, আমাদের বাড়ির দিকটায় গাড়ি যায় না। যেতে হবে হেঁটে।

হেঁটে? না না, উনি হাঁটতে পারবেন না।

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। আমি পারব। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাদের কারোরই আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। আমি মিজানের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব। চলো মিজান।

আমার ব্যবহারে টিচার এবং কমিটির লোকজন অবাক হলো। প্রধান অতিথির এ কী আচরণ!

আমি কারো দিকে ফিরে তাকালাম না। মাঠের ভেতর দিয়ে পায়েচলা পথ। জুন মাসের রোদে ঝিমঝিম করছে চারদিক। মিজানের সঙ্গে পা চালিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে টুকটাক কথা হচ্ছে।

মিজান, তোমরা ক ভাইবোন?

আমি একাই।

কী করছ তুমি? পড়াশোনা শেষ করেছ?

বিএ পাস করছি। বাবা তো আমাদের সরকারি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, সেই স্কুলে আমার চাকরি হয়েছে। কিন্তু অবস্থা ভালো

না আংকেল। বিষয়সম্পত্তি একসময় ভালোই ছিল আমাদের। বাবার চিকিৎসায় সব গেছে। এখন আমার রোজগারে কোনোরকমে সংসার চলে।

স্যারের চিকিৎসা করাতে পারছ?

ক্যানসারের আর চিকিৎসা কী করাব! যত দূর পারছি করছি। ঢাকা মেডিক্যালে নিয়া রাখছিলাম কিছুদিন। বাবায় থাকতে চাইল না। বাড়িতে চইলা আসলো। এমন অনুরোধ কইরা কইল, না আইনা পারলাম না।

এখন অবস্থা কী রকম?

ওই যে বললাম! এখন যে কয়দিন থাকে আর কী।

কথাবার্তা বলতে পারে? লোকজনকে চেনে?

জি, ওইসব ঠিক আছে। স্মৃতিশক্তিও ভালো। আপনের কথা শুইনা আমারে পাঠাইছিল।

ততক্ষণে মতি স্যারের বাড়িতে এসে উঠেছি আমরা। একেবারেই দরিদ্র ধরনের বাড়ি। ভাঙাচোরা দুটো টিনের ঘর। উঠোনের এক কোণে রান্নাবান্না। কয়েকটি মুরগি চরছে উঠোনে। প্রচুর গাছপালা বাড়িটায়। বেশ স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। বড়ঘরের পেছন দিককার জামগাছে বসে একটা কাক ক্লান্ত গলায় ডাকছিল।

কিন্তু মতি স্যারকে দেখে আমি চিনতে পারি না। এই কি সেই মানুষ!

বিছানায় পড়ে আছে শুকনো একটি কংকাল। মাথায় সামান্য কয়েকটি সাদাচুল, গোঁফদাড়ি কাঁচাপাকা। মুখটা ভেঙে শামুকের মতো হয়ে গেছে। হাত-পা যেন শুকনো কোনো ঝোপঝাড়ের ডালপালা। কিন্তু চোখ দুটো আশ্চর্য রকম চকচকে। গলার আওয়াজে কোনো মালিন্য নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব খুশি হয়েছি। আমার কথা তুমি যে মনে রেখেছ, এত বড় মানুষ হয়েও যে আমাকে দেখতে এসেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি। খুব খুশি হয়েছি।

আমি এই ঘরে ঢোকার পরই স্যারের স্ত্রী তাঁকে বিছানায় তুলে বসিয়েছেন। মিজান তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে একটি চাদর। পুরনো দিনের পালঙ্কে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছেন তিনি। আমি বসেছি তাঁর পাশে।

কিন্তু আমার কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করে না। স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ফিরে গেছি দূর অতীতে। তখন যৌবন ছিল মতি মাস্টারের। তখন যুদ্ধে যাবার সময় ছিল তাঁর।

মতি স্যার টেনে টেনে বললেন, সত্তর সালের পর তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ঠিকই কিন্তু তোমার সব খবর আমি রাখি। ভাবতে খুব ভালো লাগে যে তুমি একসময় আমার ছাত্র ছিলে।

আমারও স্যার আপনার কথা মনে ছিল। আপনার কথা ভেবে খুব গৌরব বোধ করতাম।

কীসের গৌরব? গৌরব করার মতো কী করেছি আমি?

মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, দেশ স্বাধীন করেছেন।

স্যার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তা ঠিক। আমার জীবনের ওই একটাই বড় কাজ। আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। দেশ স্বাধীন করতে পেরেছিলাম। মানুষ হিসেবে দুটো বড় ঋণ থাকে মানুষের, এক নিজের মায়ের ঋণ, আরেক দেশমায়ের ঋণ। নিজের মায়ের ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি। আমি যখন খুব ছোট তখন মা মারা যান। কিন্তু দেশমাতৃকার ঋণ আমি কিছুটা শোধ করেছি দেশের জন্য যুদ্ধ করে, দেশ স্বাধীন করে। এই অর্থে আমি খুব সুখী মানুষ।

খানিক কথা বলেই পেট চেপে ধরছিলেন স্যার। মুখে ফুটে উঠছিল তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন। সেই যন্ত্রণা চেপে কথা বলে যাচ্ছিলেন। যেন আমাকে অনেক কথা বলার আছে তাঁর।

তুমি তো লেখক, আমার একটা অনুভূতির কথা তোমাকে খুব বলতে ইচ্ছে করছে।

বলুন স্যার, বলুন।

সকালবেলা তোমার ভাবি আমাকে উঠোনের কোণে বসিয়ে রাখে। ক্যানসারের ব্যথায় আমি সারাক্ষণ ছটফট করি। কিন্তু উঠোনের মাটিতে বসার পর সেই ব্যথাটা কেমন যেন কমে আসে। মাটি যেন আশ্চর্য এক মমতা ছড়িয়ে দেয় আমার শরীরে। সেই মমতার গুণে ক্যানসারের ব্যথা ভুলে যাই আমি। বুঝতে পারি স্বাধীন দেশের মাটির এই গুণ। মৃত্যুপথযাত্রী

মানুষ যেমন মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শান্তি পায়, উঠোনের মাটিতে বসে ঠিক সেই শান্তিটাই পাই আমি। সুনীলের একটি কবিতার লাইন মনে আসে, 'বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ, এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি'। আমার জীবনের সবচাইতে বড় প্রাপ্তি কী জানো, আমি আমার নিজ হাতে স্বাধীন করা দেশের মাটিতে মরতে পারছি। এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি।

স্যারের কথা শুনে আমার বুকটা তোলপাড় করে, চোখ দুটো ছলছল করে। মনে মনে বাংলাদেশকে আমি বলি, প্রিয় বাংলাদেশ, মতি স্যারের মতো সন্তান জন্ম দিয়ে তুমি তোমার মাটিকে ধন্য করেছ।

২০১০

একটি মুখের হাসির জন্য

আপনে আসছেন কই থিকা?

বারবাড়ির সামনে দুটো জামগাছ। জামগাছের গা ঘেঁষে পাটখড়ির বেড়া। বারবাড়ির সঙ্গে ভেতর বাড়ি আলাদা করার জন্য এই ব্যবস্থা।

শিরিন দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার সামনে। অচেনা মানুষের গলা শুনে মাথায় ঘোমটা দিয়েছিল। এখন একপলক মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে অকারণেই ঘোমটা আরেকটু টেনেটুনে ঠিক করল।

সকাল দশটা-এগারোটার রোদ বেশ ভালোই তেজালো হয়েছে। জামগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েও গরম খুব একটা কম লাগছিল না ইউসুফের। কিন্তু গরমের তোয়াক্কা করল না সে। হাসিমুখে বলল, আমি এসেছি ঢাকা থেকে।

চান কারে?

এটা নাসিরের বাড়ি না? মুক্তিযোদ্ধা নাসির হোসেন? স্বাধীনতার পর পর শুনেছিলাম এলাকার সবাই তাকে নাসির কমান্ডার নামে চেনে। যদিও সে কমান্ডার ছিল না। ছিল সাধারণ একজন মুক্তিযোদ্ধা।

ইউসুফের কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শিরিন। কোনোরকমে বলল, আপনে এত কথা জানলেন কেমনে?

আমরা একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। মানে সহযোদ্ধা ছিলাম। যদিও নাসির বয়সে আমার চে' ছোট। মুক্তিযুদ্ধের সময় একুশ-বাইশ বছর বয়স ছিল। দুর্দান্ত সাহসী, টগবগে দুর্ধর্ষ ধরনের তরুণ। মৃত্যুভয় কাকে বলে জানত না। গোয়ালিমান্দ্রার অপারেশনে দারুণ সাহস দেখিয়েছিল নাসির। যে-কোনো অপারেশনে যেতে একপায়ে খাড়া। নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে

দু-তিনবার। লোকে নাসিরকে কমান্ডার বলত, আসলে কমান্ডার ছিলাম আমি। আমার নাম ইউসুফ, ইউসুফ মির্জা।

নামটা শুনে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল শিরিন, দিশেহারা হলো। কন কী? আপনে ইউসুফ ভাই? আপনের কথা কত শুনছি তার কাছে। আসেন ভিতরে আসেন।

শিরিনের পিছু পিছু ভেতর বাড়িতে ঢুকল ইউসুফ।

বাড়িটি অতি দীনদরিদ্র ধরনের। দোচালা জীর্ণ একখানা টিনের ঘর, রান্নাচালা আর একচিলতে উঠোন। উঠোনের একপাশে ভাঙাচোরা হাঁসমুরগির খোঁয়াড়ের লাগোয়া পাতিলেবুর ঝাড়। রান্নাচালার ওদিকটায় লাউ-কুমড়ো শসা ঝিঙের মাচান। দোচালা ঘরটার পেছনে দু-তিনটে আম আর একটা তেঁতুলগাছ। গাছগুলো জড়াজড়ি করে আছে বলে বাড়িটা বেশ ছায়াময়। উঠোনের একটা দিকে শুধু রোদ পড়েছে। সেই রোদে তারে শুকাতে দেয়া হয়েছে বারো-তেরো বছর বয়সি একটি মেয়ের ছিটকাপড়ের জামা। কয়েকটা হাঁস-মুরগি চরছে ওদিকপানে।

বাড়ি দেখে মনটা খারাপ হলো ইউসুফের।

শিরিন তখন ঘরে ঢুকে হাতলওয়ালা পুরনো একখানা চেয়ার এনেছে। উঠোনের ছায়ায় চেয়ার রেখে বলল, বসেন।

চেয়ারে বসতে বসতে ইউসুফ বলল, কিন্তু পাগলটা কোথায়? ইশ্ কতদিন পর দেখা হবে! আটাশ-ঊনত্রিশ বছর তো হবেই! স্বাধীনতার পর পর প্রায়ই দেখা হতো। তখনো যুদ্ধের উন্মাদনা কাটেনি, অস্ত্রটস্ত্র জমা দেইনি। তারপর আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গেল সব। আমরা একেকজন ভেসে গেলাম একেক দিকে। নাসির বিক্রমপুরের ছেলে, সে চলে এল বিক্রমপুরে, গ্রামেই সেটেল করল। আমি চলে গেলাম ইংল্যান্ডে। বিয়েশাদি করে লন্ডনে থেকে গেলাম। দেশে দু-চার বার আসা হয়েছে কিন্তু পুরনো বন্ধুদের কারো সঙ্গেই তেমন যোগাযোগ, দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

ইউসুফ একটু থামল। শিরিনের মুখের দিকে তাকাল। এবার আমি দেশে এসেছি এই একটাই উদ্দেশ্যে। পুরনো সব বন্ধুকে খুঁজে খুঁজে বের করব, তাদের সঙ্গে দেখা করব। বয়স হয়ে যাচ্ছে, থাকি বিদেশে,

কোনোদিন হার্টঅ্যাটাক-ফেটাকে শেষ হয়ে যাব, এই জীবনে কারো সঙ্গে আর দেখাই হবে না।

শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে শিরিন। ইউসুফ তার দিকে তাকাল না। পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলল, নাসির যে বাড়ি নেই তা আমি বুঝেছি। কোথায় গেছে বলতে পারবেন? একটু যদি খবর দেয়া যায়...

কথা শেষ না করে শিরিনের দিকে তাকিয়েছে ইউসুফ, তাকিয়ে বুকে কী রকম একটা ধাক্কা খেল। সিগ্রেটে টান দিতে ভুলে গেল, চোখে পলক ফেলতে ভুলে গেল।

মুখ নিচু করা শিরিনের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

যা বোঝার বুঝে গেল ইউসুফ। শিরিনের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে বসে রইল। ফাঁকা শূন্য গলায় একসময় বলল, কবে?

আঁচলে চোখ মুছে শিরিন বলল, আইজ দেড় বচ্ছর।

ও আমার চে' কত ছোট! এই বয়সেই...

কথা শেষ করে উদাস হয়ে গেল ইউসুফ। খানিক আগের উচ্ছল আবেগে ভর্তি কথা বলতে পছন্দ করা মানুষটি যেন আর নেই। এখন যে বসে আছে শিরিনের সামনে সে যেন অন্য কেউ। হতাশ ম্লান, আচমকা শোকে পাথর হওয়া একজন মানুষ।

একসময় বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইউসুফ। কত আশা করে এবার দেশে এসেছিলাম, সবার সঙ্গে দেখা করব। নাসিরের বাড়ি বিক্রমপুরের কোন গ্রামে তা বেশ ভালোই জানা ছিল, যুদ্ধের সময় একবার এসেছিলাম। এতগুলো বছর কেটে গেছে, সবকিছু একেবারেই বদলে গেছে, তার পরও বাড়ি চিনতে ভুল হয়নি। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই আসতে পেরেছি। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর একটা পরীক্ষা নিচ্ছিলাম যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে দেখি নাসিরের বাড়িটা বের করতে পারি কি না। পারলাম ঠিকই, কিন্তু যার জন্য আসা সে-ই নেই।

আঁচলে আবার চোখ মুছল শিরিন, নাক টানল।

আনমনা ভঙ্গিতে সিগ্রেটে টান দিয়ে ইউসুফ বলল, কী হয়েছিল?

লানছে ক্যানসার হইছিল। বেদম সিগ্রেট খাইত। ক্যানসার ধরা পড়নের পরও থামে নাই।

কাজ কী করত?

আমগ গেরামের পেরাইমারি ইসকুলের মাস্টার আছিল।

ততক্ষণে দুজন মানুষই কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে, কথাবার্তার আড়ষ্টতা কেটে গেছে শিরিনের। থমথমে গলায় বলল, বহুত কষ্ট পাইয়া মরছে। ক্যানসারের চিকিস্যায় বেদম টেকা লাগে। এত টেকা আমরা পামু কই? ইসকুলের ফান্ড থিকা টেকা দিছে, ছাত্রছাত্রীরা চান্দা কইরা টেকা দিছে তাও তেমুন চিকিস্যা করাইতে পারি নাই।

এই ধরনের অসুখে কিছু অবশ্য করারও থাকে না।

হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, পায়ের সামনে ফেলে জুতো দিয়ে ডলে ডলে নেভাল ইউসুফ। শিরিন বলল, নিজে তো মরছেই আমগও মাইরা থুইয়া গেছে।

কথাটা বুঝতে পারল না ইউসুফ। শিরিনের মুখের দিকে তাকাল।

শিরিন বলল, এমতেই গরিব মানুষ আমরা, জমাজমি যা অল্পবিস্তর আছিল হেই হগল বেবাক গেছে তার চিকিস্যায়। সরকারি ইসকুলের মাস্টারগ আইজকাইল ভালো অবস্তা। তারা মইরা গেলে সরকার থিকা ভালো টেকাই পায়। আমরাও পাইছি। হেই হগল বেবাগ গেছে দেনা শোধ করতে। অহন আমরা পথের ফকির। কিচ্ছু নাই। খালি এই বাড়িডা, ভাঙাচুরা ঘরডা।

আপনার সংসার তাহলে চলে কী করে?

কোনোরকমে চলে। একজন মাত্র দেওর আমার, সে থাকে ঢাকায়। সে মাসে মাসে কিছু টেকা দেয়। দুই ভাই আছে, তারা দেয় কিছু। বইনরা দেয় যহন যা পারে। আমগ বিক্রমপুর হইল ধনী মাইনষের দেশ। তয় আমগ আত্মীয়স্বজন কেঐ ধনী না। বেবাকতেই গরিব। কে কারে টানব, কন? দূরের আত্মীয় বড়লোক যারা আছে তারা কেঐ খবর লয় না। সাহাইয্যের লেইগা গেলে কুত্তা-বিলাইয়ের লাহান খেদাইয়া দেয়।

বাড়ির দশা দেখে আর শিরিনের কথাবার্তা শুনে নাসিরের ফেলে যাওয়া সংসারের অবস্থাটা পুরোপুরিই বুঝেছে ইউসুফ। বুঝে মন খুবই খারাপ হয়েছে তার। আহা কী অসহায়, হতদরিদ্র সংসার এক মুক্তিযোদ্ধার! হয়তো এরকম দশা আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধার সংসারের। কে তাঁদের খবর রাখে!

গাছপালার দিকে তাকিয়ে ম্লান গলায় ইউসুফ বলল, আপনাদের বাচ্চাকাচ্চা?

একটা মাইয়া। অহনও ছোড। তেরো-চৌদ্দ বচ্ছর বয়স।

এত কম বয়সি মেয়ে...

কথাটা শুনে শিরিন একটু লজ্জা পেল। মাথা নিচু করে বলল, আমগ বিয়া হইছিল দেরিতে। বিয়ার দুই বচ্ছর পর একটা পোলা হইয়া মরল। তার চাইর পাঁচ বচ্ছর পর হইল মাইয়াটা।

কোথায় সে? তাকে যে দেখছি না!

ইসকুলে গেছে। দোফরে আইসা পড়ব। আইজ হাফ ইসকুল।

নাম কী মেয়েটার? কোন ক্লাসে পড়ে?

নাম হইল দোয়েল। পড়ে কেলাস সেভেনে।

দোয়েল নামটা শুনে খুব ভালো লাগল ইউসুফের। মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ্। খুব সুন্দর নাম তো! দোয়েল। বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম। নিশ্চয় নাসির রেখেছিল!

হ সে-ই রাখছে। বহুত আদর করত মাইয়াটারে। মাইয়াটা আছিল তার জান।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে শিরিন বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়েছে। ঘরের লেপাপোছা পৈঠায় নরম ভঙ্গিতে বসল। আপনে আইছেন এতুক্ষুণ হইল, এক কাপ চাও আপনেরে খাওয়াইতে পারলাম না। ঘরে চা-পাতা চিনি কিচ্ছু নাই।

ইউসুফ ব্যস্ত গলায় বলল, আমাকে নিয়ে ভাববেন না। চায়ের অভ্যাস তেমন নেই আমার।

তয় দোফরে কইলাম ভাত খাইয়া যাওন লাগব। কই মাছ দিয়া ভাত খাওয়াইতে পারুম। তিন চাইরডা কইমাছ জিয়াইন্না আছে।

এমন আন্তরিক গলায় কথাটা বলল শিরিন, শুনে আবেগে বুকটা ভরে গেল ইউসুফের। এই তো চিরকালীন বাঙালি নারী। অতিথির সেবায় দরিদ্র সংসারের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদও ব্যয় করতে পারে। দু-চারটা কই মাছ আর একজন মানুষের একবেলার ভাত কি কম মূল্যবান এই সংসারে!

ইউসুফ মুগ্ধ গলায় বলল, আপনি এতটা আন্তরিকতা নিয়ে বলেছেন তাতেই আমি খুশি। ভাত খাব না। আর কিছুক্ষণ বসেই চলে যাব।

ইউসুফ আবার একটা সিগ্রেট ধরাল।

শিরিন বলল, ভাই, আপনের ছেলেমেয়ে কয়জন?

দুটো ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটা ছোট। ছোট মানে দোয়েলের চে' অনেক বড়। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। এ বছরই বিয়ে দেব ভাবছি।

শুনে মন খারাপ করা গলায় শিরিন বলল, আমার মাইয়াটারে তো মনে হয় বিয়াই দিতে পারুম না।

ইউসুফ চমকাল। কেন?

মাইয়াটার কপাল খারাপ। এমতেই গরিব ঘরের মাইয়া, বাপ নাই। তার ওপরে আইজ চাইর মাস ডাইন গালে একটা টিউমার হইছে।

কী?

হ। পয়লা পয়লা ছোডই আছিল জিনিসটা, দিনে দিনে বড় হইছে। অহন মুরগির আন্ডার সমান।

বলেন কী? ডাক্তার দেখান নাই?

ভালো ডাক্তার কই থিকা দেখামু কন? আমগ গেরামের কাশেম ডাক্তাররে দেহাইছি। সে কয় এই হগল চিকিস্যা দ্যাশগেরামে হয় না। টাউনে নিয়া অপরেশন করান লাগব। অপরেশনে অনেক টেকা লাগব। এত টেকা আমি কই পামু কন?

ইউসুফ চুপ করে রইল।

শিরিন বলল, আমার মাইয়াডা অর নামের লাহানই আছিল। দোয়েল পাখির লাহান স্বভাব। এক মিনিট থির হইয়া থাকতে পারত না। এইমিহি যাইতাছে ওইমিহি যাইতাছে। কথায় কথায় খিলখিল কইরা হাসতাছে। টিউমার হওনের পর মাইয়াডা আমার বদলাইয়া গেছে। দৌড়াদৌড়ি ছটফটানি বন্ধ হইয়া গেছে, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। মাইয়াডা আর অহন হাসেই না। টিউমারের বেদনায় রাইত দোফরে উইঠা মাঝে মাঝে কান্দে। ইসকুলে যায় ওড়না দিয়া মুখ ঢাইকা। টিউমারডা য্যান কেঐ দেখতে না পায়।

কথা বলতে বলতে আবার চোখে পানি আসে শিরিনের। চোখ মুছতে মুছতে সে বলল, কাশেম ডাক্তার কইছে অপরেশন না করলে এই টিউমার থিকা ক্যানসার হইতে পারে। ক্যানসার হইলে বাপের লাহান মাইয়াডাও যাইব।

প্রথমে নাসিরের মৃত্যুর কথা শুনে বুকে এক ধাক্কা খেয়েছে ইউসুফ, এখন দোয়েলের কথা শুনে আরেক ধাক্কা খেল। বুকটা হু হু করতে লাগল তার। এতকাল পর এ কোন দুঃখ-হতাশার মধ্যে এসে পড়ল সে! কী স্বপ্ন দেখে এসেছিল, কী হলো তার পরিণতি!

না এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকতে আর ভালো লাগছে না। যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে সরে পড়তে পারলেই ভালো।

আচমকাই যেন তারপর উঠে দাঁড়াল ইউসুফ। আমি তাহলে আসি এখন।

ইউসুফের আচরণে বেশ অবাক হলো শিরিন। সেও উঠে দাঁড়াল। আর একটু বসবেন না? বসেন আরেকটু। মাইয়াটা আসুক। বাপের মুখে কত গল্প শুনছে আপনের। আপনেরে দেখলে খুব খুশি হইব।

ইউসুফ বিনীত গলায় বলল, না। আমার সময় নেই। তা ছাড়া ওইটুকু মেয়ের ওই কষ্টের মুখ আমি দেখতেও চাই না। নাসিরের মৃত্যুর কথা শুনে যে দুঃখ পেয়েছি সেই দুঃখ সামলাতে পারব কিন্তু দোয়েলের মুখ দেখে যে দুঃখ পাব তা সামলাতে পারব না। সে আসার আগেই চলে যেতে চাই।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল ইউসুফ। গুনে গুনে পাঁচ শো টাকার দশটা নোট মুঠো করে দিল শিরিনের হাতে। এখানে পাঁচ হাজার টাকা আছে। এটা রাখুন। দোয়েলের চিকিৎসা করাবেন।

একসঙ্গে এতগুলো টাকা অনেকদিন চোখে দেখেনি শিরিন, সে বেশ দিশেহারা হলো। প্রথমে চোখ দুটো চঞ্চল হলো তার, তারপর পানিতে ভরে গেল। কান্নাকাতর কৃতজ্ঞ গলায় বলল, আল্লায় আপনের ভালো করুক ভাই। আল্লায় আপনের ভালো করুক।

ইউসুফ আর কোনো কথা বলল না। হনহন করে হেঁটে বারবাড়ির দিকে চলে গেল।

দুই

আজ শুক্রবার।

দোয়েলের স্কুল নেই। যেদিন স্কুল না থাকে দোয়েল একটু বেলা করে ওঠে। আজও তাই উঠেছে। উঠে হাতমুখ ধুয়ে বই নিয়ে বসেনি, বেতের সাজিতে মুড়ি আর ছোট্ট একটা আখিগুড়ের টুকরো নিয়ে বসেছে। দরজার সামনে বসে উদাস হয়ে গুড়মুড়ি খাচ্ছে।

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে সকালবেলার রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। সেই রোদে হাঁস-মুরগিগুলো খুদকুঁড়ো খাচ্ছে। শিরিন ব্যস্ত হয়েছে সংসারের কাজে। এইমাত্র উঠোন ঝাড় দিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। দুদিন ধরে মনটা একটু ভালো শিরিনের। স্বামীর বন্ধু ইউসুফ মির্জা আসার পর, সে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাওয়ার পর থেকে শরীরের গতি যেন বেড়ে গেছে তার। হয়তো মেয়েটার অপারেশনের একটা কিছু ব্যবস্থা এবার করা যাবে। কাশেম ডাক্তারের কাছে গিয়ে কথাও বলে এসেছে কাল। এই টাকায় হবে না, টাকা আরো লাগবে। সেই টাকা কীভাবে জোগাড় করা যায়, গ্রামের কাকে কাকে ধরলে, কোন আত্মীয়র কাছে গেলে টাকা দু-চার শো করে পাওয়া যাবে এইসব ভেবেছে কাল অনেক রাত পর্যন্ত। সব মিলিয়ে দশ-বিশজন লোকও যদি পাশে দাঁড়ায়, টাকা যা উঠবে, কাজ হয়ে যাবে। ওই যে কথায় আছে না, দশের লাঠি একের বোঝা।

আর যদি এভাবে না হয় তাহলে আর একটা বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধিটাও কাশেম ডাক্তারই দিয়েছেন। ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর চিঠিপত্র কলামে 'আমার মেয়ের মুখের হাসি ফিরিয়ে দিন' বা এই জাতীয় শিরোনাম দিয়ে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে। পাঁচ-দশটা চিঠি লিখলে দু-একটা চিঠি ছাপা হবেই। সেই চিঠি পড়ে দেশের দয়াবান মানুষরা কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে দোয়েলকে সাহায্য করতে। এইভাবে অনেক অসহায় মানুষের উপকার হয়। তা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে শুনলে আর কেউ না হোক মুক্তিযোদ্ধারা অন্তত সাহায্য করবেন। দেশে বিত্তবান মুক্তিযোদ্ধাও তো কম নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার, গত চার মাসে এইসব বুদ্ধি কারো মাথায় আসেনি। ইউসুফ মির্জা এসে যেন ঘোরতর অন্ধকারে মোমের আলো জ্বেলে দিয়ে গেলেন। এখন চারদিকে হয়তো আরো একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠবে।

আহা, সেই মানুষটার সঙ্গে দোয়েলের দেখা হয়নি। সে স্কুল থেকে ফেরার আগেই চলে গেছেন তিনি। বাবার মুখে কত গল্প একদিন শুনেছে এই মানুষের, তাদের বাড়ি এসে ঘুরেও গেলেন এত বছর পর, দোয়েলকে না দেখেই তার চিকিৎসার জন্য অতগুলো টাকা দিয়ে গেলেন অথচ দোয়েলের সঙ্গে তাঁর দেখাই হলো না। হয়তো কোনোদিন হবেও না। কারণ তিনি বাংলাদেশে থাকেনই না।

আজকের সকালটা এসব ভেবেই কাটিয়েছে দোয়েল। তারপর ভেবেছে টিউমারের কথা। যদি টাকা জোগাড় করে সত্যি সত্যি অপারেশন করা যায়, তাহলে একদমই আগের মতো হয়ে যাবে তার মুখ। আগের মতো খিলখিল করে হাসতে পারবে, কথা বলতে পারবে। মুখে কোনো দাগ থাকবে না, মুখটা হয়ে যাবে আগের মতো নিখুঁত সুন্দর। যে-কেউ সেই মুখ দেখে বলবে, বাহ্ কী সুন্দর চেহারা মেয়েটির! কী মিষ্টি মুখ!

নাকি অপারেশনের দাগ থেকে যাবে গালে! টিউমার থাকবে না ঠিকই, টিউমারের চিহ্ন, কাটা দাগ থেকে যাবে!

তাহলে আর লাভ হলো কী? মুখে বড় একটা খুঁত তো তার থেকেই গেল?

আবার একটা ভয়ের কথাও বলেছেন কাশেম ডাক্তার। এই ধরনের টিউমার থেকে অনেক সময় ক্যানসার হয়। যদি তেমন হয়, তাহলে আর মুখের দাগ হাসিটাসি নিয়ে ভেবে কী লাভ! ক্যানসার হলে বাঁচার আশা নেই। বাবার মতো ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

এসব ভেবে বিষণ্ন মুখে বারবাড়ির দিকে এসেছে দোয়েল, লম্বা চওড়া, সুন্দর পোশাক জুতো পরা একজন স্নিগ্ধ মুখের মানুষ এসে দাঁড়াল তার সামনে। মানুষটার হাতে সুন্দর একটা শপিংব্যাগ, ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে বেশ দামি ধরনের কয়েকটি প্যাকেট। দেখে বোঝা যায় খাবারের প্যাকেট। বিদেশি বিস্কুট চকোলেট এসব হবে। আর মানুষটার গা থেকে কেমন একটা বাবা বাবা গন্ধ আসছিল।

বাইরের যে-কোনো মানুষের সামনে দোয়েল এখন তার মুখটা ঢেকে রাখে। মুখের ওই বিশ্রী টিউমার সে কাউকে দেখাতে চায় না। হঠাৎ লম্বা হয়ে ওঠা টিংটিংয়ে মেয়েটির ওড়না ব্যবহারের দরকার হয় না, তবু মুখ ঢাকার জন্য ওড়না পরে সে।

গলার কাছে ওড়না এখনো আছে কিন্তু মুখ ঢাকার কথা মনে হলো না দোয়েলের। দুঃখী বিষণ্ন মুখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই মানুষটিও দোয়েলের মতো করেই তাকিয়েছিল তার দিকে। তবে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই হাসিমুখে মায়াবী গলায় কথা বলে উঠল, তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। তুমিই দোয়েল। দোয়েল ছাড়া এত সুন্দর, মিষ্টিমুখ আর কোনো মেয়ের হবে!

বলেই গভীর মমতায় দোয়েলের চিবুকের কাছটা ধরল। সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেছি, দুটো দিন এজন্য কষ্ট পেয়েছি। সে কারণেই আবার এলাম।

রান্নাঘরের দিক থেকে ইউসুফের গলা বুঝি শুনতে পেয়েছিল শিরিন, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল। ইউসুফকে দেখে মাথায় ঘোমটা দিল। ব্যস্ত গলায় বলল, আপনে আসলেন কখন?

একহাত দোয়েলকে জড়িয়ে ধরে ইউসুফ বলল, এই তো এক্ষুনি।

আসেন, আসেন।

সেদিনকার মতো আজও ছুটে গিয়ে ঘর থেকে চেয়ার আনল শিরিন। আঁচলে চেয়ার মুছে বলল, বসেন ভাই, বসেন।

চেয়ারে বসে শপিংব্যাগটা দোয়েলের হাতে দিল ইউসুফ। এটা তোমার জন্য। এখানে মজার মজার বিস্কুট চকোলেট ক্যান্ডি আছে। এগুলো ঘরে রেখে এসো।

কিন্তু মানুষটার কাছ থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করছে না দোয়েলের। কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে অনেকদিন পর দূর কোনো পরদেশ থেকে যেন ফিরে এসেছেন বাবা। চোখের আড়াল হলেই বুঝি দোয়েলকে ছেড়ে আবার উধাও হয়ে যাবেন।

তবু ঘরে গিয়ে চৌকির ওপর শপিংব্যাগটা রেখে এল দোয়েল। কাছে আসতেই তাকে বুকের কাছে টেনে নিল ইউসুফ। গভীর মমতায় আঙুলের ডগায় আলতো করে ছুঁয়ে দিল তার টিউমারটা। বিশাল এক ভরসা দেয়া গলায় বলল, এ এমন কিছু টিউমার না! সামান্যই। ছোট্ট একটা অপারেশন লাগবে।

ইউসুফের এই কথাটা যেন শুনতে পেল না শিরিন। বলল, আইজ কইলাম ভাত না খাইয়া যাইতে পারবেন না। আমি অহনই ভাত চড়াইতাছি। কইমাছ চাইরটা আছে।

ইউসুফ স্নিগ্ধ মুখে বলল, তা না হয় খেলাম। কিন্তু আপনি যদি রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে যান তাহলে কথা বলব কখন? আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

শিরিন কথা বলবার আগেই দোয়েল বলল, তাইলে চেরটা রান্ধনঘরের সামনে লইয়া যাই। মায় রানল আর আপনে কথা কইলেন।

দোয়েলের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল ইউসুফ। বাহ্! এই মেয়ে তো খুব শার্প। ভাবি, আপনি সব গোছগাছ করে বসুন, আমি চেয়ার নিয়ে ওখানে আসব। এই ফাঁকে দোয়েলের সঙ্গে একটু গল্প করি।

আচ্ছা।

শিরিন ব্যস্তভঙ্গিতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ইউসুফ আবার হাসিমুখে তাকাল দোয়েলের দিকে। আমি কি তোমার সামনে একটা সিগ্রেট খেতে পারি, মা?

দোয়েল মাথা নাড়ল।

সিগ্রেটের গন্ধে তোমার খারাপ লাগবে না তো?

না। বাবায় অনেক সিগারেট খাইত। বাড়িত থাকলে সব সময় থাকতাম বাবার লগে লগে। বাবার সিগারেটের গন্ধ আমার ভালো লাগত। বাতাসে সিগারেটের গন্ধ পাইলেই আমি বুঝতাম বাবায় আসতাছে।

ইউসুফ কথা বলল না। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরাল। তারপর আচমকা বলল, আমি সেদিন ইচ্ছা করেই তোমার সঙ্গে দেখা করে যাইনি, জানো?

দোয়েল অবাক হলো। ক্যান?

আমি যে তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসিনি। একদম খালি হাতে এসেছিলাম, এজন্য।

কিন্তু আপনের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম আসে নাই। খালি আপনের কথা চিন্তা করছি। বাবার কাছে আপনের কথা শুনছি তো! আপনেরে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল।

সিগ্রেটে টান দিয়ে ইউসুফ বলল, ভাবির মুখে তোমার নাম শুনে তোমাকেও খুব দেখার ইচ্ছা হয়েছিল আমার। যে মেয়ের নাম দোয়েল, তাকে না দেখে আমি যাব কেন? কিন্তু যখনই তোমার টিউমারের কথা শুনলাম, মনটা এত খারাপ হলো। ফুলের মতো একটি মেয়ের মুখে টিউমার! টিউমারের জন্য সে হাসতে পারছে না, এসব ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল তোমার মুখটা আমি সহ্য করতে পারব না, আমার বুকটা ফেটে যাবে। অত কষ্ট পাওয়ার চে' তোমাকে না দেখে চলে যাওয়াই ভালো।

ইউসুফ আবার সিগ্রেটে টান দিল। কিন্তু যেতে যেতে আমি তোমার কথা খুব ভাবলাম। তোমার বাবার কথা ভাবলাম, নিজের কথা ভাবলাম। আমরা মুক্তিযোদ্ধা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি। কত বড় অপারেশনে যোগ দিয়েছি, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আর আজ ছোট্ট একটা মেয়ের বিপদের কথা জেনেও আমি তার সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে যাচ্ছি! এসব ভেবে নিজের ওপর খুব রাগ হলো, জানো? নিজেকে কাপুরুষের মতো মনে হলো। অথচ আমি তো তা নই, আমি তো একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে আমি পালিয়ে যাব কেন?

ইউসুফের কথার অনেকটাই বুঝতে পারছিল না দোয়েল। কিন্তু তার খুব ভালো লাগছিল শুনতে। অপলক চোখে ইউসুফের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

সিগ্রেটে টান দিয়ে, উঠোনের হাওয়ায় ধোঁয়া ছেড়ে ইউসুফ বলল, এজন্য ঢাকায় ফিরে গিয়ে বড় বড় কয়েকটি হাসপাতালে যোগাযোগ করলাম আমি, কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম। ভাবির মুখে তোমার টিউমারের কথা যতটা শুনেছি ততটাই বললাম তাদের।

তার টিউমারের ব্যাপারে ঢাকার বড় ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছে ইউসুফ, হাসপাতালে কথা বলেছে শুনেই বিষণ্ন মুখটা উজ্জ্বল হলো দোয়েলের। গভীর আগ্রহের গলায় বলল, ডাক্তাররা কী কইল?

বড় ডাক্তাররা রোগী না দেখে কিছু বলেন না। তবু আমার মুখ থেকে যতটা শুনেছেন, বললেন, এটা তেমন সিরিয়াস কিছু ব্যাপার না।

একটু থামল ইউসুফ। সিগ্রেটে টান দিল। তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে যখন কথা বলছি, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছি, তখন আমার কী মনে হচ্ছিল জানো, মনে হচ্ছিল আমি যেন একাত্তর সালে ফিরে গেছি। আমাকে যেন একটা যুদ্ধে নামতে হবে। আমি যেন সেই যুদ্ধের রসদ জোগাড় করছি।

বলেই সরল মুখ করে হাসল ইউসুফ। তোমাকে এসব বলতে খুব ভালো লাগছে।

সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে পায়ের কাছে ফেলল ইউসুফ। জুতোয় ডলে সিগ্রেট নেভাল। বলল, তারপর বুঝলে মা, যুদ্ধের পুরো প্রিপারেশন নিয়ে তোমাদের বাড়ি এলাম।

মুখটা একটু ঝুঁকিয়ে দোয়েলের কানের কাছে নিয়ে গেল ইউসুফ। কেন এসেছি জানো? তোমাকে নিয়ে যেতে। তোমাকে নিয়ে যাওয়া মানেই যুদ্ধটা আমি শুরু করলাম।

দোয়েল অবাক গলায় বলল, কোথায় নিয়া যাইবেন আমারে?

ঢাকায়। হাসপাতাল রেডি করে এসেছি, ডাক্তার রেডি করে এসেছি। আজ ঢাকায় পৌঁছেই সেই হাসপাতালে নিয়ে যাব তোমাকে। ডাক্তাররা আগে তোমার টিউমার পরীক্ষা করবেন। তারপর অপারেশন।

শুনে আনন্দ উত্তেজনায় বুক ভরে গেল দোয়েলের। ইচ্ছে হলো এখনই রান্নাঘরে দৌড়ে গিয়ে খবরটা মাকে দিয়ে আসে। তা করল না দোয়েল। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, অপারেশন করলে পুরা ভালো হইয়া যামু আমি?

হ্যাঁ। পুরো ভালো হয়ে যাবে।

আগের মতো হাসতে পারুম?

অবশ্যই পারবে।

মুখে কোনো দাগ থাকব না?

না, একটুও দাগ থাকবে না। কারণ তোমাকে করা হবে বেশ দামি অপারেশন। কসমেটিক সার্জারি। কসমেটিক সার্জারিতে কোনো দাগ থাকে না। অপারেশনের পর মুখ দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না যে তোমার মুখে একটা টিউমার ছিল।

এবার নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না দোয়েল। দৌড়ে মা'র কাছে গেল। জোয়ার জলের মতো কলকল করে মুহূর্তে ইউসুফের মুখে শোনা সব কথা বলে দিল।

শিরিন তখন চুলোয় ভাত বসিয়ে কইমাছ কুটতে বসেছে। সব শুনে গভীর আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গেল। কাজ করতে ভুলে গেল।

দোয়েল ততক্ষণে আবার ছুটে এসেছে ইউসুফের কাছে। ভয় মেশানো উত্তেজিত গলায় বলল, অপরেশন করলে ব্যথা পামু না আমি?

দুহাতে দোয়েলকে বুকের কাছে টেনে আনল ইউসুফ। না, একটুও ব্যথা পাবে না। তুমি তো টেরই পাবে না অপারেশনটা কখন হলো। আচ্ছা শোনো, তুমি কি ইনজেকশনে ভয় পাও?

মুখের মজাদার ভঙ্গি করে দোয়েল বলল, না। একবার পা মচকাইয়া গেছিল। তখন বাবায় কাশেম ডাক্তারের কাছে নিয়া ইনজেকশন দেওয়াইয়া আনছিল। একটুও ব্যথা পাই নাই। খালি মনে হইল একটা পিঁপড়ার কামড়।

তাহলে তো কথাই নাই। অপারেশানের আগে একটা ইনজেকশান দেবে তোমাকে। তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম থেকে উঠে দেখবে টিউমারটা নেই। তুমি সেই আগের দোয়েল হয়ে গেছ।

শুনে কী যে মুগ্ধ হলো মেয়েটি! হাসার চেষ্টা করল কিন্তু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসতে পারল না। দেখে বুকটা হু হু করে উঠল ইউসুফের। হয়তো কষ্টটা কাটাবার জন্যই উঠে দাঁড়াল সে। বলল, কী হলো দোয়েল, তোমার জন্য যে এত খাবার আনলাম, খাচ্ছ না কেন?

পরে খামু নে।

না এক্ষুনি খাও। যাও, প্যাকেট খুলে দেখো যেটা ভালো লাগে নিয়ে এসো। তুমি খাবে আর ভাবির সঙ্গে কথা বলব আমি।

তাইলে চেয়ারটা আমি রান্ধনঘরের সামনে নিয়া দেই?

তুমি দেবে কেন? আমিই তো নিতে পারি। কিন্তু চেয়ার এখন নেব না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলব।

আইচ্ছা।

দোয়েল ঘরে ঢোকার পর ইউসুফ এল রান্নাঘরের সামনে। শিরিনকে বলল, মেয়ের মুখে তো সবই শুনেছেন। তবু আবার বলি, আপনাদের দুজনকে আমি ঢাকায় নিয়ে যেতে চাই। দোয়েলের চিকিৎসাটা করাতে চাই।

শুনে আবেগে কথা বলতে পারল না শিরিন। মাছ কুটতে কুটতে ইউসুফের দিকে তাকাল। গভীর কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো ছলছল করছে তার। কোনোরকমে বলল, কী কমু ভাই, কন! খালি এটুকু কইতে পারি, আপনে মানুষ না, আপনে ফেরেশতা।

ইউসুফ কিছু বলবার আগেই ওয়েফার ধরনের লম্বা দুটো বিস্কুট হাতে দোয়েল এসে দাঁড়াল তার পাশে। কামড়ে কামড়ে বিস্কুট খেতে লাগল। খাওয়ার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল স্বাভাবিক মানুষের মতো খেতে পারছে না সে। অসুবিধা হচ্ছে।

একপলক দোয়েলকে দেখে শিরিনের দিকে তাকাল ইউসুফ। ভাত খেয়েই রওনা দিতে চাই। আপনি সেইভাবে ব্যবস্থা করুন ভাবি।

দোয়েলকে বলল, কাপড়চোপড় গুছিয়ে নাও। আজই ঢাকায় নিয়ে যাব তোমাদেরকে। এখান থেকে সরাসরি হাসপাতালে।

শুনে শিরিন এবং দোয়েল দুজনেই দিশেহারা হলো।

শিরিন বলল, আইজই যাওন লাগব! তাহলে এইদিকে কী ব্যবস্থা করুম? বাড়িঘর হাঁস-মুরগি এইসব কে দেখব?

ইউসুফ বলল, পাড়াপ্রতিবেশী কাউকে বলুন। একজন এমন কাউকে যদি পাওয়া যায়, যত দিন দরকার বাড়িতে থাকল। তার খাওয়া-খরচের টাকা আমি দিয়ে যাব।

দোয়েল লাফিয়ে উঠে বলল, ওমা, হাসু ফুপুরে থুইয়া যাও। তার তো কোনো বাড়িঘর নাই, সংসার নাই। এহেক দিন এহেক বাড়িতে থাকে। অহন আছে বেপারীবাড়িতে। আমি গিয়া তারে ডাইকা লইয়াহি। টেকা দিলেই দেখবা খুশি হইয়া থাকব।

শিরিন কথা বলবার আগেই ইউসুফ বলল, যাও মা, ডেকে নিয়ে এসো।

তিন

দুপুরের পর পর বাড়ি থেকে বেরুল তিনজন মানুষ।

হাসুকে বাড়িতে রেখে বেশ সহজেই সব ব্যবস্থা করা গেছে। মহিলাকে পাঁচ শো টাকা দিয়ে এসেছে ইউসুফ। ওতেই মহা খুশি সে। তা ছাড়া ঘরে চাল ডাল যা আছে একজন মানুষের বেশ কিছুদিন চলবে। তত দিনে দোয়েলের অপারেশন করিয়ে ফিরে আসতে পারবে শিরিন।

গ্রামের পথে দোয়েলের হাত ধরে হাঁটছে ইউসুফ। দোয়েল শিরিনের জামা কাপড়ের ছেঁড়াখোঁড়া রেকসিনের ব্যাগটা তার হাতে। বেশভূষার সঙ্গে ব্যাগটা একদমই মানাচ্ছে না। কিন্তু ওসবের তোয়াক্কা করছে না ইউসুফ। উচ্ছ্বসিত গলায় দোয়েলের সঙ্গে কথা বলছে। তোমাদেরকে নিয়ে আরো অনেক প্ল্যান আছে আমার। উত্তরায় আমার একটা ছয়তলা বাড়ি আছে। নিচে গাড়ি রাখার জায়গা আর পাঁচতলায় দশটা ফ্ল্যাট। নটা ভাড়া দেয়া, একটা আমার জন্য। দেশে এলে ওই ফ্ল্যাটটায় আমি থাকি। অপারেশনের

পর তুমি আর তোমার মা থাকবে আমার ফ্ল্যাটে। বাড়িভাড়ার টাকা থেকে তোমাদের খরচ দেয়া হবে। আমি সব ব্যবস্থা করব। উত্তরায় অনেক ভালো ভালো স্কুল আছে। সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি করে দেব তোমাকে। এই মুহূর্ত থেকে তোমাদের দুজনের দায়িত্ব আমার।

ইউসুফ এবং দোয়েলের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে এসব কথা শুনছিল শিরিন, চোখে পানি আসছিল তার।

বড় রাস্তায় একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। ইউসুফকে দেখেই ব্যস্ত ভঙ্গিতে নেমে এল ড্রাইভার। হাত থেকে ব্যাগটা নিল।

দোয়েল উত্তেজিত গলায় বলল, আমরা এই গাড়িতে কইরা যামু?

হ্যাঁ। গাড়িটা আমারই।

তারপর শিরিনের দিকে তাকিয়ে বলল, উঠুন ভাবি।

মাইক্রোবাসের পেছন দিককার সিটে বসল শিরিন, সামনের দিকে দোয়েল আর ইউসুফ। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, ইউসুফ বলল, জানো দোয়েল, এই মুহূর্তে যুদ্ধের সময়কার একটা গানের কথা খুব মনে পড়ছে আমার।

আনন্দে বিভোর হওয়া গলায় দোয়েল বলল, কোন গান?

'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।'

এই গানটা আমি জানি। বাবার মুখে কত শুনছি।

আলতো করে দোয়েলের গালটা একটু ছুঁয়ে দিল ইউসুফ। আজ এত কাল পর মনে হচ্ছে আর একটা যুদ্ধ যেন তোমাকে নিয়ে শুরু করলাম। তোমার মুখের হাসি ফিরিয়ে দেয়ার যুদ্ধ। আগের যুদ্ধটার মতো এই যুদ্ধেও জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৯৯৮

নেতা যে রাতে নিহত হলেন

পুলিশ অফিসারটি মার্জিত ধরনের। চেয়ারে গা এলিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে সিগ্রেট টানছিলেন। টেবিলের সামনে দুজন সাধারণ পুলিশের সঙ্গে অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারা, গ্রাম্য লোকটিকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন। বসার ভঙ্গি বদলালেন না। সিগ্রেটে টান দিয়ে বললেন, কী, ঘটনা কী?

দুজন পুলিশের একজন বলল, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছিল।

অপরজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমারও স্যার। লোকটার চালচলন আচার-আচরণ খুবই সন্দেহজনক। নেতার বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করছিল।

নেতার কথা শুনে পুলিশ অফিসার বেশ ধাক্কা খেলেন। গা এলানো ভাব মুহূর্তে কেটে গেল তাঁর। চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। টেবিলের ওপর, হাতের কাছে ছিল পুলিশি টুপি। টুপি নিয়ে যত্ন করে মাথায় পরলেন। যেন এইমাত্র দায়িত্বে বহাল হলেন। এতক্ষণ যেন ছুটি কাটাচ্ছিলেন।

হাতের সিগ্রেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখ তুলে লোকটির দিকে তাকালেন অফিসার। আকাশি রঙের ঝুল পকেটওয়ালা শার্ট পরা। ডোরাকাটা লুঙ্গি বেশ খানিকটা উঁচু করে পরেছে। যেন নিচু করে পরলে ধুলোময়লা লেগে যাবে। লোকটির খালি পা এবং মুখের রং প্রায় একই রকম। রোদেপোড়া, নিরেট কালো। মাথার ঘন কালো চুল কদমছাঁট দেয়া। দাড়িগোঁফ দু-একদিন আগে কামিয়েছে। থানার ভেতরকার উজ্জ্বল আলোয় অফিসার দেখতে পেলেন, লোকটির গালের শক্ত চামড়া ভেদ করে ধারালো দাড়িগোঁফ মাথাচাড়া দিচ্ছে।

লোকটির ঠোঁট পুরু। নাক থ্যাবড়া। পরিশ্রমী, পেশিবহুল শরীর। চোখ দুটি বেশ কৌতূহলী। বুকের কাছে জীর্ণ কাপড়ের একটি পুঁটলি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

অফিসার গম্ভীর গলায় বললেন, নাম কী?

প্রশ্ন কাকে করা হয়েছে বুঝতে পারল না লোকটি। সঙ্গের পুলিশ দুজনের দিকে তাকাল।

একজন বলল, আমাদের না, তোমার নাম জানতে চেয়েছেন।

অপরজন বলল, আমাদের নাম স্যারে জানেন। তোমার নাম বলো।

লোকটি সামান্য গলা খাঁকারি দিল। তারপর অমায়িক মুখ করে বলল, আমার নাম সাহেব রতন। রতন মাঝি।

কী করো?

দুজন পুলিশের একজনের স্বভাব হচ্ছে কথা একটু বেশি বলা। আসলে অফিসারকে তোয়াজ করা। সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, নামের শেষে যখন মাঝি আছে নিশ্চয় নৌকা বায় স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে রতন নামের লোকটি হা হা করে উঠল। না না সাহেব, না, নৌকা বাই না। নৌকার মাঝি না আমি। আমার বাপ-দাদায় আছিল মাঝি। সেই থেকে আমাদের পদবি হয়েছে মাঝি।

অফিসার আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললেন, তাহলে কী করো তুমি?

রতন বলল, আমি সাহেব ভাগচাষি।

বেশি কথা বলা পুলিশটি বলল, চাষি বুঝি কিন্তু ভাগচাষি তো বুঝি না। ভাগচাষি জিনিসটা কী?

অফিসার এবার রেগে গেলেন। আঙুল তুলে বললেন, তুমি চুপ করো। আমি যতক্ষণ কথা বলব, আমার সামনে একটিও কথা বলবে না। একদম পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে।

জি আচ্ছা, স্যার।

আবার কথা। তোমাকে না বললাম একদম চুপ। একদম পাথর।

লোকটি যেন সত্যি সত্যি পাথর হয়ে গেল।

অফিসার আবার রতনের দিকে তাকালেন, বলো।

রতন বলল, কী বলব সাহেব?

কী করো তুমি?

ওই যে বললাম, ভাগচাষি। নিজের জমি নাই। পরের জমি আধাআধি ভাগে চাষ করি।

বাড়ি কোথায়?

তা অনেক দূর সাহেব। পদ্মার ওপার গিয়ে তিন-চার ঘণ্টা একটানা হাঁটতে হয়। গ্রামের নাম উদয়পুর।

এখানে এলে কী করে?

এখানে তো সাহেব আপনার লোকজন ধরে নিয়ে এল!

অফিসার বিরক্ত হলেন। তাঁর স্বভাব হচ্ছে একটু একটু করে অনেকক্ষণ ধরে রাগেন। তারপর একসময় ফেটে পড়েন। রাগের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। গম্ভীর গলায় বললেন, এখানে মানে আমি শহরের কথা বলেছি।

রতন সরল ভঙ্গিতে হাসল। শহরে সাহেব লঞ্চে করে এসেছি। পদ্মার পার থেকে সকালবেলা চড়েছি, শেষ বিকালে শহরে এসে নামলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কাল দুপুররাতে। ওই যে বললাম, তিন-চার ঘণ্টা হেঁটে নদীতীর, তবে লঞ্চঘাট।

তুমি কি কথা একটু বেশি বলো?

রতন খুবই লজ্জা পেল। জে না সাহেব। আপনে জিজ্ঞেস করলেন তাই বললাম।

শহরে তুমি আগে কখনো এসেছ?

জে না।

এই প্রথম?

জে।

কেন এসেছ?

বললে সাহেব আপনে অন্য কিছু ভাববেন না তো?

বলো, তবে সত্য কথা বলবে। মিথ্যে বললে কঠিন শাস্তি হবে।

আমি সাহেব নেতাকে দেখতে আসছি।

অফিসার চমকে উঠলেন। পাথর হয়ে থাকা সেই দুজন পুলিশ এই প্রথম মুখ ঘুরিয়ে দুজন দুজনার চোখের দিকে তাকাল। তারপর আগের ভঙ্গিতে ফিরে আবার পাথর হয়ে গেল।

অফিসার নড়েচড়ে উঠলেন। নেতাকে দেখতে এসেছ মানে কী? নেতাকে তুমি চেনো? নেতা তোমাকে চেনেন?

রতন অমায়িক মুখ করে বলল, নেতাকে কে না চেনে সাহেব! তাঁরে চিনব না এ হয় নাকি? নেতাও তো দেশের সব মানুষকেই চেনেন। মুখখানা দেখলে আমাকেও চিনবেন। আমিও তো দেশের মানুষ!

তুমি যে নেতার বাড়ির পাশে ঘুরঘুর করছিলে, বাড়ি তুমি চিনলে কী করে?

লঞ্চ থেকে নেমে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে চলে গেছি। ম্যালা রাত হয়ে গেছে। এত রাতে তো নেতাকে আর দেখতে পাব না। ভাবছিলাম তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় বসে থাকব। দিনের বেলা তিনি যখন বেরোবেন দুচোখ ভরে তাঁকে একবার দেখব। পোঁটলাটা নামিয়ে রাখব তাঁর পায়ের কাছে।

অফিসার হাসলেন। মাথায় ছিট আছে তোমার?

জে না সাহেব।

পোঁটলায় কী?

চিড়ে। খুব ভালো চিড়ে সাহেব। বাড়ির নামায় এক চিলতে জায়গায় কালিজিরে ধান হয়েছিল। খুব অল্প হয়েছিল। পৌনে দুই সেরের মতো চিড়ে হয়েছে। চিড়েটা সাহেব নেতার জন্য নিয়ে এসেছি। নেতা একমুঠ মুখে দিলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে আমার। আমি সাহেব নেতাকে বড় ভালোবাসি। গরিবের ভালোবাসা, নেতাকে কেমন করে জানাব! ম্যালা দিনের স্বপ্ন ছিল তাঁরে একবার সামনাসামনি দেখব। পায়ের কাছে চিড়ের পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে পা দুখানা একবার ছুঁয়ে দেখব।

রতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে আর হলো কই! আপনার লোকজন ধরে নিয়ে এল।

ঠিকই করেছে। তুমি আসলে বদমাশ।

জে?

হ্যাঁ, তুমি বদ মতলবে নেতার বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছিলে। এতক্ষণ ধরে যা বললে সবই মিথ্যে। বানোয়াট। তোমার মতো লোকের এত পয়সা ব্যয় করে, এত পরিশ্রম করে, এত দূর থেকে শুধু নেতাকে একপলক দেখতে আসার কথা না। চিড়াটা বিক্রি করলে ভালো পয়সা পেতে। তুমি এসেছ নিশ্চয় অন্য কোনো মতলবে। ভালোবাসা দেখাতে না।

এতক্ষণের হাসিমুখ মুহূর্তে চুন হয়ে গেল রতনের। একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল সে। কাতর গলায় বলল, না সাহেব, না। আমি একটাও মিথ্যা বলি নাই। আমরা মিথ্যা বলি না। মানুষ গরিব হতে পারি সাহেব, কিন্তু ভালোবাসাটা খাঁটি। আমাদের মতো গরিব মানুষরাই নেতাকে বেশি ভালোবাসে। আল্লার কসম খেয়ে বলছি, আমি নেতাকে দেখতে আসছি। এ আমার ম্যালা দিনের স্বপ্ন। আপনে বিশ্বাস করেন।

একটু একটু করে অনেকক্ষণ ধরে জমে ওঠা রাগটা এবার ফাটল অফিসারের। প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন তিনি। চোপ। সেই ধমকে রতন তো বটেই পাথর হয়ে থাকা পুলিশ দুজনও কেঁপে উঠল। পুলিশ দুজনের দিকে তাকিয়ে অফিসার বললেন, পোঁটলাটা নাও। খুলে দেখো ভেতরে কী আছে।

সঙ্গে সঙ্গে রতনের বুক থেকে চিড়ার পোঁটলা ছিনিয়ে নিল একজন। থানার মেঝেতে ফেলে খুলল। চিঁড়াগুলো ছড়িয়ে গেল চারদিকে। চিঁড়ার তাজা, মিষ্টি গন্ধে থানার গুমোট পরিবেশ ম ম করে উঠল।

অফিসারের কথা শুনে রতনের তখন মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড খরায় চষা জমির মাটির ঢেলা যখন পাথরের মতো হয়ে ওঠে, সেই ঢেলা ভাঙবার জন্য চাষি যে ইটামুগুর ব্যবহার করে, সে রকম ইটামুগুর দিয়ে হঠাৎ করেই কেউ তার বুকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছে। ও রকম আঘাতে দম বন্ধ হয়ে যায় মানুষের। চোখ ঠিকরে বেরোয়। মানুষ কোনো শব্দ করতে পারে না।

রতনও কোনো শব্দ করতে পারল না।

অফিসার বললেন, এই চিঁড়া কেমিক্যাল টেস্টে পাঠাও আর বদমাশটাকে লকআপে ভরো।

বেশি কথা বলা পুলিশটি বলল, একটা কথা বলব, স্যার?

অফিসার রাগী চোখে তাকালেন। কী?

চিঁড়ার গন্ধটা বড় ভালো।

তাতে কী হয়েছে?

বলছিলাম কি একটু মুখে দিয়ে দেখব?

অফিসার প্রচণ্ড রাগলেন। যদি তোমার কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়? যা বললাম তাই করো। টেস্টে পাঠাও।

রতন তারপর আর একটিও কথা বলেনি। একেবারেই পাথর হয়ে গিয়েছিল। থানা হাজতের দেয়ালে হেলান দিয়ে সারা রাত বসে থেকেছে। একজন টহলদার পুলিশ পাঁচ মিনিট পর পর গরাদের সামনে দিয়ে টহল দিয়ে গেছে। রতন তার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

ভোরবেলা কী রকম একটা গুঞ্জন উঠল থানায়। কী রকম একটা ছুটোছুটি, চাপা ফিসফাস। খানিকপর সেই দুজন পুলিশ এসে লকআপ খুলল। রতন মাঝি, বেরোও।

কথা বেশি বলা পুলিশটির প্যান্টের দুই পকেট বেশ ফোলা। রতন নিঃশব্দে লকআপ থেকে বেরোল। পুলিশ দুজন ঠেলে ঠেলে তাকে এনে দাঁড়া করাল সেই অফিসারের সামনে।

অফিসার কী রকম দুঃখী মুখ করে চেয়ারে বসে আছেন। চোখে উদাসীনতা কিংবা অন্য কিছু। রতনকে দেখে তার দিকে তাকালেন। গভীর দুঃখের গলায় বললেন, নেতা কাল রাতে নিহত হয়েছেন। আমরা খবর পেয়েছি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ লোকজন, নেতার আদর্শে বিশ্বাসী, একই রাজনীতি দীর্ঘদিন করেছে, তারা ষড়যন্ত্র করে নেতাকে হত্যা করেছে। তোমার ওপর আমি অবিচার করেছি ভাই। যাও বাড়ি যাও তুমি।

বেশি কথা বলা পুলিশটি তখন তার প্যান্টের পকেট থেকে চিঁড়া বের করে অবিরাম মুখে পুরছে। রতন বুঝে গেল এই সেই চিঁড়া। ভালোবেসে নেতার জন্য নিয়ে এসেছিল সে। কালিজিরা ধান কত যে যত্নে বুনেছিল বাড়ির নামায়! সেই ধান শুকিয়ে কত যে যত্নে চিঁড়াটা কুটে দিয়েছিল তার কৃষাণি!

এসব ভেবে চোখ ভরে আসার কথা রতনের, কিন্তু হলো উল্টো। চোখ দুটো কী রকম জ্বলে উঠল তার। অফিসারের দিকে তাকিয়ে শীতল গম্ভীর গলায় রতন বলল, আমাকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না সাহেব। আমাকে হাজতেই রাখুন। ছেড়ে দিলে নেতা হত্যার প্রতিশোধ নেব আমি।

১৯৯০

যমুনা

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎই চোখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি ফ্ল্যাটের দরজায় একটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ে শিশু। রোগা, ফরসা, মাথায় লালচে ধরনের পাতলা চুল। শরীরের তুলনায় মাথাটা যেন একটু বড়। মুখটা মিষ্টি, চোখ দুটো ডাগর।

ন'টার মতো বাজে। আমার সামনে কাচের সেন্টার টেবিল। তার ওপর একগাদা দৈনিক পত্রিকা। নামকরা কাগজগুলো ধরে ধরে আমি চেক করছি। কোন কাগজ কী লিড করল, কোন জরুরি নিউজ আমাদের কাগজ মিস করল ইত্যাদি দেখছি। পায়ের কাছে এক লিটারের পানির বোতল। আটটার দিকে কাগজ নিয়ে বসেছি এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে পানিটাও খেয়েছি। বোতল প্রায় শেষ। এখন অর্ধেকটা এমারিল খাব। দশ মিনিট পর খাব একটা গ্যালভাস। তার দশ মিনিট পর নাশতা। টেবিলে জাহাঙ্গীর সব রেডি করে রেখেছে।

বাচ্চাটা কে?

দেখে বোঝা যায় ফ্ল্যাট বাসিন্দাদের কারো বাচ্চা না। চেহারা পোশাকে দারিদ্র্যের ছাপ। কোনো ফ্ল্যাটের বুয়াদের বাচ্চা হবে।

আমার ধারণাই ঠিক।

পাশের ফ্ল্যাটের গেট খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। মলিন সালোয়ার-কামিজ পরা। ফরসা মুখ ঘামে ভেজা, রোগা এবং বিষণ্ন। কাজের মেয়ে বোঝা যায়। আমার দরজায় শিশুটিকে দেখে তার হাত ধরল। মুখে বিরক্তির চিহ্ন। বেরিয়েছিস কেন? আমি কি কাজ করব না তোকে আগলাব? আর যদি দরজা খুলে বেরিয়েছিস!

বিব্রত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। আমি পাশের ফ্ল্যাটে কাজ করি সাহেব। আমার মেয়ে কোন ফাঁকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।

না, না মনে করার কী আছে? বাচ্চার নাম কী?

মেয়েটি তার বাচ্চার দিকে তাকাল। নাম বলো।

পাখির মতো মিষ্টি গলায় শিশুটি বললো, জয়া।

বাহ্! খুব সুন্দর নাম। দাঁড়াও দাঁড়াও।

ফ্রিজে কিছু ক্যান্ডি আমি সব সময়ই রাখি। স্নিকার মার্স, সাফারির ওয়েফার। সন্ধ্যার দিকে মাঝে মাঝে সুগার কমে যায়। তখন খাই। সুগার না কমলেও কখনো কখনো খাই। ডায়াবেটিকদের যা হয় আর কি! মিষ্টি জাতীয় জিনিস দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে।

একটা স্নিকার এনে জয়ার হাতে দিলাম।

এই স্নিকার দেয়া থেকেই শুরু হলো ঘটনা।

এখন বলি, দিনটা শুরু করি কীভাবে?

ঘুম ভাঙে ভোর পাঁচটায়। উঠেই ওয়াশরুমে গিয়ে মুখটা ভালো করে ধুই। তারপর চলে যাই লেখার রুমে। একটানা তিন ঘণ্টা লিখি। সাতটার দিকে উঠে জাহাঙ্গীর লেগে যায় তার কাজে। অর্থাৎ আমার নাশতা তৈরি করা। এক বাটি সবজি, দুখানা মাঝারি সাইজের আটার রুটি, বড় লেবুর এক টুকরা লেবু, দুখানা ফুল বয়েলড ডিম, দশ বারো টুকরা পাকা থাই পেঁপে, এই আমার নাশতা। ডিম দুটোর শুধু সাদা অংশ প্রতিদিনই খাই। সপ্তাহে তিন দিন খাই একটা করে কুসুমসহ ডিম। ডাইনিং টেবিলের পাশে ওষুধের ব্যাগ। নাশতার বিশ মিনিট আগে হাফ এমারিল, দশ মিনিট আগে একটা গ্যালভাস। দেশের তৈরি গ্যালভাস খাই না। আমারটা সুইজারল্যান্ডের তৈরি। দুটোই ডায়াবেটিসের ওষুধ।

নাশতার সর্বশেষ আইটেম পাকা পেঁপে। তার আগে একটা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আর একটা এ টু জেড ভিটামিন ট্যাবলেট। নাশতার মিনিট দশেক পর প্রেশারের ওষুধ এমডোকল একটা আর কার্ডিওকর একটা। বছর পাঁচেক ধরে এই নিয়মে চলছি।

আমার দেখভালের দায়িত্ব জাহাঙ্গীরের। বছর পঁয়ত্রিশের যুবক। প্রথম স্ত্রী সানজি নামের বছর চারেক বয়সের একটি মেয়ে রেখে জাহাঙ্গীরকে ছেড়ে চলে যায়। জাহাঙ্গীর তারপর আবার বিয়ে করে। সৎমা এসে সানজির সঙ্গে সৎমায়ের মতোই আচরণ শুরু করে। সানজিকে ঠিকঠাকমতো খেতে দেয় না। মারধর করে। এই দেখে মেয়েটিকে বুকে তুলে নেয় জাহাঙ্গীরের বড় বোন নূরজাহান।

নূরজাহান বহু বছর ধরে কাজ করে আমার মগবাজারের ফ্ল্যাটে। আমার স্ত্রীর দিক থেকে পরিচিত। ওদের বাড়ির কাছেই, লুপ্ত হয়ে যাওয়া ধোলাইখালের পশ্চিম পাশে বহুকালের পুরনো একটা মন্দির। মন্দির আঙিনায় ঘর তুলে থাকে কয়েকটি পরিবার। নূরজাহানরা থাকত ওখানে।

জায়গাটা গেণ্ডারিয়াতে। মন্দিরের জায়গাটা পড়েছে কলুটোলায়। ওদের পরিবারের অনেকেই আমার শ্বশুরবাড়িতে কাজ করত। পরে নূরজাহান চলে আসে আমার সংসারে। দীর্ঘদিনের কাজের লোকদের সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। মালিকদের কাছে কাজের লোকদের অধিকারবোধ জন্মায়। নূরজাহানের তেমন এক অধিকারবোধ জন্মেছে আমাদের ওপর।

সানজিকে নিয়ে একদিন সে আমাদের ফ্ল্যাটে এল। আমার স্ত্রীকে খুলে বলল সব ঘটনা। সানজিকে সে তার সঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটেই রাখতে চায়। মেয়েটির মায়াবী মুখ দেখে নূরজাহানের কথা আমরা ফেলতে পারিনি। সানজি আমাদের সংসারে থেকে গেল।

নূরজাহানের স্বামী একসময় কোনো এক ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করত। তিনটি ছেলেমেয়ে তাদের। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে বরিশালে। তার অবস্থা ভালোই। মেজোটা ছেলে। সে বাংলাবাজার এলাকায় ব্লক তৈরির কাজ করে। ছোট মেয়েটার নাম বর্ষা। সে ফাইভে না সিক্সে যেন পড়ে।

স্বামীর সঙ্গে নূরজাহানের বয়সের ব্যবধান অনেক। লোকটা এখন আর কিছু করে না। বউ-ছেলের রোজগারে বসে বসে খায়। বড় মেয়েও সাহায্য করে। সপ্তাহ দশদিন পর এক বেলার জন্য নূরজাহান স্বামী ছেলেমেয়ে দেখতে যায়। তবে মোবাইলে খবর নেয় রোজই একবার দু'বার।

নূরজাহানের রান্নার হাত অসাধারণ! তার হাতের ছোঁয়ায় অতি সামান্য খাবারও অসামান্য হয়ে যায়। নূরজাহানের রান্নায় আমরা তো বটেই আমাদের চারপাশের আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত মুগ্ধ।

আমার স্ত্রী সানজিকে একসময় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ভালো খাওয়াদাওয়া আর জামা কাপড়ে মেয়েটির রূপ খুলতে লাগল। সানজির রূপে আমাদের ফ্ল্যাট আলোকিত হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে সে নূরজাহানের সঙ্গে গেন্ডারিয়ায় গিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করে আসে। বাবার জন্য ব্যাপক টান।

এই মেয়েটি অদ্ভুত এক দুর্ঘটনায় মারা গেল।

সকালবেলা স্কুল থেকে ফিরছে, সঙ্গে আমাদের আরেকজন বুয়া। রাস্তার ধারের এক বাড়ির লোহার গেট ভেঙে পড়ল সানজির ওপর। বুয়া আর সে একসঙ্গেই হাঁটছিল। বুয়ার কিছুই হলো না, চাপা পড়ল সানজি। লোকজন কোলে করে তাকে আদ-দ্বীন হাসপাতালে নিয়ে গেল। বুয়া কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাদেরকে খবর দিল। আমি সেদিন বাসায়। ছুটে গেলাম হাসপাতালে। ডাক্তাররা বললেন, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালে নিয়ে যেতে। নিয়ে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর সানজি মারা গেল।

সানজিকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম। 'সানজির গল্প'। সেই গল্প পড়ে ফোনে ধ্রুব এষ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। খুবই আবেগপ্রবণ, নরম হৃদয়ের মানুষ। ও যে মাপের রংতুলির শিল্পী, ছোটদের লেখায় একেবারেই ভিন্ন মাত্রার এক লেখক, ওর তো এমনই হওয়ার কথা। দেখতেও সাধুসন্তের মতো। ধ্রুবকে আমি খুবই ভালোবাসি।

সানজির মৃত্যু আমাদের পরিবারে গভীর ছায়া ফেলেছিল।

এই ঘটনার তিন-চার বছর পর জাহাঙ্গীরের আবির্ভাব। সে একসময় চায়ের দোকানদার ছিল। বাংলাবাজার এলাকার ফুটপাতে বসে চা বিক্রি করত। সানজির মা খুব সুন্দরী ছিল। সে চলে যাওয়ার পর, সানজির মৃত্যুর পর ধস নেমে গেল জাহাঙ্গীরের জীবনে। চা বিক্রির টাকায় সংসার চলে না। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে একটি মেয়ে জন্মেছে। তাদের নিয়ে দুর্বিষহ কষ্টের দিন।

এ সময় আমার জীবন বাঁক নিয়েছে অন্যদিকে।

দেশের বৃহত্তম শিল্প গোষ্ঠী 'বসুন্ধরা গ্রুপের' 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় আমি জয়েন করেছিলাম জয়েন্ট এডিটর হিসেবে। তেমন কোনো কাজ নেই। যখন ইচ্ছা অফিসে আসি, যখন ইচ্ছা চলে যাই। অফিস থেকে গাড়ি দেয়া হয়েছে। ওই নিয়ে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে যাই পত্রিকার কাজে। পত্রিকাসংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে বেড়াই সারা দেশে। আমাকে নেয়াও হয়েছিল এইসব কাজের জন্যই।

বছর দেড়েকের মাথায় সম্পাদক চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এমডি আমাকে ডেকে নিয়ে সম্পাদকের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। এত বড় দায়িত্ব পড়ল মাথায়, আমি খুবই দিশেহারা। অফিস বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়। প্রথমেই মনে হলো মগবাজার থেকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় 'কালের কণ্ঠ' অফিসে আসতে যেতে দু'ঘণ্টা দু'ঘণ্টা চার ঘণ্টা সময় চলে যাবে। তাহলে? সম্পাদকের কাজ তো চব্বিশ ঘণ্টার! ম্যানেজ করব কী করে?

চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম, এমডি সাহেবকে বললাম। শুনে তাঁরা আমাকে তিন হাজার স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দিতে চাইলেন অফিসের কাছে। ভাড়া ষাট হাজার টাকা, অফিস দেবে। ফ্ল্যাট সাজাতে যা যা লাগে তাও দেবে। শুনে আমার স্ত্রী বললেন, আমরা মগবাজারেই থাকি, তুমি গিয়ে ওই ফ্ল্যাটে থাকো। প্রতি শুক্রবারে এসে আমাদের সঙ্গে থেকে যেয়ো।

ঠাট্টা করে বললেন, তোমার এখন পঞ্চান্ন বছর বয়স, আমিও পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে দুজন দুদিকে থাকলে অসুবিধা কী? কদিন পর বড় মেয়ের বিয়ে দেব। দু-তিন বছর পর দেব ছোটটার। ছেলে এখনো ছোট। তুমি তোমার মতো থাকো, আমি থাকি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার মতো। মাঝে মাঝে দেখা হবে, এই যথেষ্ট।

আইডিয়া মন্দ লাগল না। মনে পড়ল আমার বাবার কথা।

বাবাকে আমরা ডাকতাম আব্বা। ষাটের দশকের গোড়ার দিককার কথা। আমার বয়স পাঁচ-ছ বছর। বিক্রমপুরের মেদেনীমণ্ডল গ্রামে নানার বাড়িতে থাকি। আব্বা চাকরি করেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে। স্ত্রী-সন্তানসন্ততি রেখেছেন শ্বশুরবাড়িতে। তখনকার দিনে শনিবারে হাফ অফিস রবিবারে ছুটি। শনিবার অফিসে হাজিরা দিয়েই সদরঘাটে গিয়ে লঞ্চে চড়তেন

আব্বা। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসটা ছিল লক্ষ্মীবাজারে। সেখান থেকে সদরঘাট কয়েক মিনিটের হাঁটা রাস্তা।

শেষ বিকেল কিংবা গোধূলিবেলায় আব্বা গিয়ে হাজির হতেন আমার নানাবাড়িতে। কাঁধে একটা রেক্সিনের ব্যাগ, দুহাতে দুটা চটের ব্যাগ। আয় রোজগারের সাধ্যানুযায়ী আমাদের জন্য পাউরুটি বিস্কুট সাগরকলা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। শনিবার আর রবিবার রাত আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ফজরের লঞ্চে ঢাকায় রওনা দিতেন।

আমিও কি আব্বার সেই পথ ধরব? ঢাকায় থেকেও ঢাকা বিক্রমপুরের জীবন! ষাটের দশকের মতো।

ধরলাম পথটা। ঠিক আছে, সপ্তাহে ছ'দিন থাকি বসুন্ধরায়। শুক্রবার ডে অফ। বৃহস্পতিবার রাতে মগবাজারে এসে শনিবার সকালে ফিরে গেলেই হলো।

কিন্তু তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট দিয়ে কী করব? এত বড় ফ্ল্যাটে একা একজন লোক থাকে কী করে?

আমার ছোট মেয়েটি ঠাট্টাপ্রিয়। সে বলল, বাবা, তুমি একটা বিয়ে করে নাও!

আমি হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকালাম। তুমি কি বলো?

আমার কোনো আপত্তি নেই। এই বয়সে তোমার মতো পচা চেহারার লোককে কেউ বিয়ে করবে না। আমি নিশ্চিত।

কিন্তু তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট!

আমার কিঞ্চিৎ ভূতের ভয় আছে। একা ঘরে থাকতে পারি না। বিদেশে গেলে হোটেলের রুমে সারা রাত লাইট জ্বালিয়ে রাখি। ঢাকার বাইরে গেলেও একই অবস্থা। একা ঘরে মনে হয় চোখ মেললেই দেখব আজদাহা কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কেউ। বুকের ওপর চেপে বসেছে অশরীরী আত্মা।

না, এত বড় ফ্ল্যাটের দরকার নেই। কোম্পানির টাকা নষ্ট হবে, আমারও সেভাবে থাকা হবে না। চেয়ারম্যান সাহেবকে খুলে বললাম সব। শুনে তিনি আমাকে ট্যানামেন্ট হাউজের দশটা বিল্ডিংয়ের একটাতে এগারো-বারো শো

স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলেন। ছোট পরিবার থাকার জন্য চমৎকার ফ্ল্যাট। কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাট। ভাড়ার বালাই নেই। মাঝারি সাইজের তিনটা বেডরুম। মোটামুটি প্রশস্ত ড্রয়িংডাইনিং। সোফা ফ্রিজ ডাইনিং টেবিল, তিন চারটা বুক শেলফ, বেডরুমে যা যা লাগে সব। একটা লেখার রুম, আরেকটা রুম ফাঁকা। ওই রুমে আমার দেখাশোনার লোক থাকবে।

দেখাশোনার লোক হিসেবে জাহাঙ্গীরের আগমন।

বসুন্ধরায় ফ্ল্যাট রেডি হয়েছে শুনে স্ত্রী চিন্তিত হলেন। আমার দেখভালের জন্য কাকে দেবেন ওই ফ্ল্যাটে। ছোট্ট একটা পরিবার হলে ভালো হয়। ফাঁকা রুমটায় থাকবে। চলার মতো বেতন দেওয়া হবে। শুনে নূরজাহান বলল জাহাঙ্গীরের কথা। বেকার, সংসার চালাতে পারে না। তিন বছরের একটা মাত্র মেয়ে। সেই মেয়েও চুপচাপ ধরনের। আমার কোনো ডিস্টার্ব হবে না। জাহাঙ্গীর খুবই কর্মঠ যুবক। হাজার বারো টাকা বেতন দিলেই হবে।

জাহাঙ্গীর এসে যুক্ত হলো আমার সঙ্গে।

সবই ঠিক ছিল। জাহাঙ্গীরের বউর পেটে যে আরেকটি বাচ্চা এই কথাটা নূরজাহান এবং জাহাঙ্গীর দুজনেই আমাদের কাছে চেপে গিয়েছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে যখন জানলাম তখন আর কী করা! জাহাঙ্গীর অনেকখানি মানিয়ে নিয়েছে আমার সঙ্গে।

যথাসময়ে তাদের একটা পুত্রসন্তান হলো। হাসপাতাল ইত্যাদির খরচ আমিই দিলাম। সমস্যা দেখা দিল নবজাতকটিকে নিয়ে। সারা দিন তার কোনো আওয়াজ নেই। আমি রাতে বাসায় ফেরার পরেই সে ত্রাহি ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। রাত বারোটার দিকে শুরু করে ভোর চারটা পর্যন্ত একটানা কাঁদে। আমার খুবই ডিস্টার্ব হয়।

এ ক্ষেত্রেও সহায়ক হলেন স্ত্রী। জাহাঙ্গীরকে বললেন তিন-চার হাজারের মধ্যে কাছাকাছি কোথাও একটা রুম ভাড়া করে বউ-বাচ্চা রাখতে। দিনের বেলা সে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসবে রাতের বেলা আমার সঙ্গে এসে ফ্ল্যাটে থাকবে। রুম ভাড়ার টাকাটা আমরা দিয়ে দিব।

জাহাঙ্গীর সত্যিই করিৎকর্মা। দিন পনেরোর মধ্যেই সেভাবে সব গুছিয়ে ফেলল। টেনাম্যান্ট হাউজের ফ্ল্যাটে শুরু হলো দুই বিবাহিত ব্যাচেলারের জীবন। সপ্তাহে ছয় দিন আর পাঁচ রাত্রির জীবন।

দিনে দিনে এই জীবনে আমরা দুজনই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমি আর জাহাঙ্গীর।

সাড়ে ন'টার দিকে আমি নাশতা করতে বসি। জাহাঙ্গীর এক মগ চা আর তিনখানা রুটি নিয়ে চলে যায় তার রুমে। চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে রুটি খায়। এই তার নাশতা।

ওষুধ খাওয়া শেষ করে খানিক পায়চারি করি আমি। ফোনে স্ত্রী কন্যাদের সঙ্গে কথা বলি। ইতোমধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক বছর আমেরিকায় কটিয়ে মেয়ে মেয়ের জামাই দুজনেই দেশে ফিরেছে। জামাই একটা ইউনিভার্সিটির লেকচারার। মেয়ে ব্যাংকে চাকরি করে। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মোহাম্মদপুরে থাকে। ভালোই আছে। ছোট মেয়ে নর্থ সাউথে বিবিএ পড়ছে। আমার অফিসের কাছেই তার ক্যাম্পাস। ইউনিভার্সিটিতে আসতে-যেতে দু'ঘণ্টা করে চার ঘণ্টা সময় যাচ্ছে তাতে তার কিছুই যেন আসছে-যাচ্ছে না। দু-একবার বলেছি, আমার বসুন্ধরার ফ্ল্যাটে থাকো। তাতে কষ্ট কম হবে। সে থাকবে না। মগবাজারের ফ্ল্যাটে নিজের রুম ছাড়া নাকি ঘুম হবে না।

আর আমার হয়েছে উল্টো। মগবাজারের ফ্ল্যাটেই আমার ঘুম আসতে চায় না। বসুন্ধরার নিরিবিলি ফ্ল্যাটে চুপচাপ জীবনটা আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

সকাল দশটার মধ্যে গোসল-টোসল সেরে আমি একদম ফ্রি। অফিসে যাই সাড়ে এগারোটায়। হাতে দেড় ঘণ্টা সময়। এই সময়টায় গান শুনি কিংবা বই পড়ি। কোনো কোনোদিন জরুরি মিটিং থাকে। অফিসের বাইরে নানা রকম কাজ থাকে। ওসবেও ছুটতে হয়। ওই ধরনের কাজ না থাকলে সাড়ে এগারোটায় অফিসে গিয়ে একটানা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত থাকি।

আগে মগবাজারের বাসা থেকে ড্রাইভারের সঙ্গে খাবার পাঠিয়ে দিতেন স্ত্রী। ড্রাইভারের নাম মতিন। ছোট মেয়েকে ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে আসত অফিসে। দুপুরের খাওয়া শেষ হলে হটপট তুলে রাখত গাড়িতে। পরদিন আবার নিয়ে আসত দুপুরের খাবার। রাতে খাই রুটি সবজি। ওসব জাহাঙ্গীরই করতে পারে।

স্ত্রীকে বললাম, শুক্রবার শুক্রবার জাহাঙ্গীরকে মগবাজারে ডাকো। মাছ মাংস ভালো রান্না করতে শেখাও। দুপুরের খাবার নিয়ে তাহলে আর কোনো ঝামেলা থাকে না।

দু-তিন শুক্রবারের ট্রেনিংয়ে জাহাঙ্গীর পাকা রাঁধুনি হয়ে গেল। তার মানে আমি একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মগবাজারের ওপর আর নির্ভরই করতে হয় না।

সাড়ে ছয়টার দিকে ফ্ল্যাটে ফিরে আধঘণ্টা খানিক রেস্ট নিয়ে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট এক্সারসাইজ করি। হালকা গরম পানিতে গোসল করে ডিনার সেরে নটার দিকে আবার অফিস। ফাস্ট এডিশন শেষ করে ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে পৌনে এগারোটা-এগারোটা।

কোনো কোনো সন্ধ্যায়ও থাকে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। ডিনারে যেতে হয় দামি দামি জায়গায়। সব মিলিয়ে এই হচ্ছে আমার এখনকার জীবন।

শুক্রবার দিনটা পরিবারের জন্য। ভাইবোন বন্ধুবান্ধব, বিয়েশাদি ইত্যাদি। কোনো কোনো প্রকাশক আসেন শুক্রবার সকালের দিকে। বইপত্রের খবরাখবর, রয়্যালটির হিসাব, আগামী ফেব্রুয়ারিতে কী কী বই লিখব সেসব পরিকল্পনা। যদিও এসবই সামলায় শাহীন। তার পরও নিজে মাঝে মাঝে প্রকাশকদের সঙ্গে বসি।

শাহীন শুধু বইপত্র আর প্রকাশকই সামলায় না, আমার পুরো সংসারই সামলায়। আমার হাতের লেখা সে ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। নিচতলার ফ্ল্যাটের একটা রুমে তার অফিস করে দিয়েছি। প্রতিদিন যতটা লিখি ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিই তাকে। সে কম্পোজ করে। আমি কম্পিউটার কম্পোজ পারি না। সাবেকি আমলের হাতের লেখাই চালিয়ে যাচ্ছি।

শাহীন গত কুড়ি বছর ধরে আমার সঙ্গে। দিনে দিনে আমার পরিবারের অংশ হয়ে উঠেছে। সংসারে হেন কাজ নেই যা সে না করে। আমরা প্রত্যেকেই তার ওপর খুব নির্ভরশীল। শাহীনের মতো সৎ নির্লোভ মানুষ আজকালকার দিনে পাওয়া যাবে না। মাটির মানুষ বলতে যা বোঝায় শাহীন হচ্ছে তাই। ফাঁকিঝুঁকি-মিথ্যাচার কাকে বলে শাহীন জানে না।

সব মিলিয়ে এই হচ্ছে আমার এখনকার জীবন। এই জীবনে এসে ঢুকল ওই তিন বছরের মেয়েটি। জয়া। সঙ্গে ওর মা যমুনা।

জয়াকে প্রথম দিন আমি ক্যান্ডি দেয়ার ফলে শিশুটির ভালোরকম একটা লোভ জন্মালো। মায়ের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই ন'টার সময় সে আসে। যমুনা তার কাজের ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজায়। আর জয়া এসে দাঁড়ায় আমার

ফ্ল্যাটের খোলা দরজায়। বুঝতে পারি শিশুটি কেন দাঁড়িয়েছে। আর এমন মিষ্টি করে হাসে, মুখের দিকে তাকালেই মায়া লাগে।

প্রতিদিনই আমি তাকে কিছু না কিছু দিতে লাগলাম। কোনোদিন একটা ক্যান্ডি, কোনোদিন একটা কমলা বা আপেল, কোনোদিন একটা কলা। এক প্যাকেট বিস্কুট ছিল টেবিলের ওপর। খাওয়াই হচ্ছিল না। পুরো প্যাকেটটা একদিন দিয়ে দিলাম জয়াকে। একদিন দুটো মিষ্টি দিলাম। একদিন দেয়ার মতো কিছুই ছিল না, এক শোটা টাকা দিলাম। যা ইচ্ছে হয়, কিনে খাও গিয়ে।

জয়া যে কী খুশি! কী আনন্দিত। তার এই আনন্দিত মুখ দেখার জন্যই ন'টা বেজে গেলেও ফ্ল্যাটের দরজা আমি বন্ধ করি না। মায়ের হাত ধরে মেয়েটির আসতে দেরি হলে, নাশতা করতে বসেও দরজার দিকে তাকাই। জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করে খোঁজখবর নিই।

জয়ার জন্য আমার যে এটা বিশেষ মমতা তৈরি হয়েছে এটা যমুনা তো টের পেয়েছেই, জাহাঙ্গীরও খুব ভালোভাবেই বুঝেছে। ওদের খবরাখবর জাহাঙ্গীর রাখে। এর মধ্যে দিন সাতেক জয়াকে দেখি না। যমুনাও আসে না। কাজ ছেড়ে দিল নাকি?

পাকিস্তানি পরিবারটির সঙ্গে আমি কথা বলি না। তাদের ছোট ছোট দুটি মেয়ে নিজেদের মতো চলাফেরা করে। খোলা দরজা কিংবা জানালা দিয়ে কখনো কখনো আমার ফ্ল্যাটে উঁকি দেয়। এটুকুই। আমি দু-এক দিন ডেকেছি। কী রকম লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়। হাজব্যান্ড ওয়াইফ আর দুই বাচ্চা নিয়ে তাদের সংসার। ভদ্রলোক কোনো একটা টেক্সটাইল মিলে কাজ করেন। একটু মোটা ধাচের নিরীহ চেহারা। খুবই অর্ডিনারি প্যান্টশার্ট আর জুতো পরে কাজে যায়। মাথায় অ্যাশ কালারের একটা গোল টুপি। আমার খোলা দরজার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় গোলাপপানি টাইপের একটা পারফিউমের গন্ধ আসে। কখনো মুখোমুখি দেখা হলে সে আমাকে সালাম দেয়। সালাম বিনিময় ছাড়া কোনো কথা হয় না।

ভদ্রমহিলাকেও দু'চারবার দেখেছি। ঘর থেকে তেমন বের হয় না। অথবা আমি যখন ফ্ল্যাটে থাকি না তখন বোধহয় বের হয়। ফ্ল্যাটের দরজা-জানালা দিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকায়। ধবধবে ফরসা, ভালোই মোটা। সিনথেটিকের সালোয়ার কামিজ পরে থাকে, মাথায় ওড়নার ঘোমটা।

জাহাঙ্গীর একটু একটু উর্দু জানে। আলাপী টাইপের মানুষ। তার সঙ্গে বোধহয় পাকিস্তানি পরিবারটির কথাবার্তা হয়।

জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করলাম, যমুনা আর জয়ার খবর কী, বলো তো? বেশ কয়েক দিন দেখি না!

জাহাঙ্গীর বলল, সেও কয়েক দিন ধরে দেখে না।

খবর নিয়ে দেখো তো। কাজ ছেড়ে দিয়ে গেল কি না?

জাহাঙ্গীর খবর নেয়ার আগেই, পরদিন ন'টার দিকে দেখি জয়ার হাত ধরে যমুনা কাজে এসেছে। মেয়ের মাথা ন্যাড়া, মায়ের মুখে হাতে শুকিয়ে আসা গোটাগাটি।

যমুনা, কী হয়েছে তোমার?

জলবসন্ত হয়েছিল, স্যার।

জয়াকে একটা আপেল দিলাম। কিছুক্ষণ পর সেই আপেল হাতে ফিরে এল মেয়েটি। আপেল পচা।

খুবই লজ্জা পেলাম। দেয়ার সময় খেয়াল করিনি। পচা আপেল ফেলে দিয়ে দুটো তাজা আপেল ধরিয়ে দিলাম।

ক'দিন পর পাশের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যমুনা আমার ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে জয়া আছে। আজ তাকে একটা ক্যান্ডি দিলাম। তখন সাড়ে দশটার মতো বাজে। সোফায় বসে আমি চা খাচ্ছি। ন'টার দিকে একটা কমলা দিয়েছিলাম জয়াকে। তারপর আবার এল কেন?

যমুনা বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

বলো।

আমার হাজব্যান্ড একটা এনজিওতে কাজ করত। বেতন পেত পনেরো হাজার টাকা। বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরা ভালোই চলতাম। মাস দুয়েক হলো চাকরি নেই। খুবই কষ্টে আছি স্যার। আমার হাজব্যান্ড বিএ পাস। আপনি যদি তাকে একটা চাকরি দেন, তাহলে আমার স্যার বুয়ার কাজটা করতে হয় না। আমি লেখাপড়া জানা মেয়ে। এসএসসি পাস করেছিলাম। অভাবের সংসার, বাবা কলেজে পড়াতে পারেননি। বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি স্যার দয়া করে...

আমি অবাক। তাই তো বলি, এত সুন্দর ভাষায় কথা বলা মেয়ে, উচ্চারণ টুচ্চারণ সুন্দর, তার তো কাজের বুয়া হওয়ার কথা না!

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বাগেরহাটে। আমার বাবা স্যার একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা তিন বোন। বাংলাদেশের তিনটা নদীর নামে আমাদের নাম রেখেছিলেন বাবা। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা স্লোগান ছিল 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' এইজন্য বাবা তার তিন মেয়ের নাম রেখেছিলেন পদ্মা মেঘনা যমুনা। বড় দুবোনের বিয়ে হয়েছে মোটামুটি ভালো ঘরে। টাকাপয়সা নেই কিন্তু ভদ্র পরিবার। আমার শ্বশুরবাড়িরও একই অবস্থা। ও ঢাকায় চাকরি নিয়ে এল। একটা পরিবারের সঙ্গে তিন হাজার টাকায় সাবলেট থাকি। ভালোই চলছিলাম। হঠাৎ চাকরিটা স্যার চলে গেল।

এ সময় পাকিস্তানি পরিবারের ছোট মেয়েটি এসে আমার ফ্ল্যাটে একটু উঁকি দিয়েই চলে গেল।

যমুনা বলল, আমাকে দেখে গেল স্যার। বুয়ার কাজটাও যায় কি না।

কেন? তুমি কী অন্যায় করেছ?

এরা চায় না তাদের বাড়ির কাজের বুয়া কারো সঙ্গে কথা বলুক। জয়াকে আপনি খাবার টাবার দেন এটাও পছন্দ করে না।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, বেতন কত দেয় তোমাকে?

দু'হাজার টাকা।

যদি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়, মাসের শুরুর দিকে এসে আমার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নিয়ে যাবে।

যমুনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। আমি যে বুয়ার কাজ করি এটা আমাদের বাড়ির কেউ জানে না। কাজ করা খারাপ না। পেটের দায়ে মানুষ তো কাজ করবেই। কিন্তু স্যার, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা ভাতায় আমাদের সংসার চলে। বাবার শরীরটা ভালো না। প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকেন। আমি বুয়ার কাজ করছি এটা শুনে তিনি কতটা রাগ করবেন আমি জানি না। তবে যদি শোনেন আমি একটা পাকিস্তানি পরিবারের কাজের বুয়া তাহলে প্রচণ্ড রাগ করবেন। বলবেন, যাদের কারণে একাত্তর

সালে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি মারা গেছে, দুতিন লাখ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছেন, সেই পাকিস্তানিদের বাড়ির কাজের বুয়া হয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে? এ কথা শোনার আগে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। এই মুহূর্তে তুই ওই কাজ ছেড়ে দে। দরকার হলে না খেয়ে মরে যাবি, তাও পাকিস্তানিদের বাড়িতে কাজ করতে পারবি না।

যমুনার কথা শুনতে শুনতে আমার ভেতরটা একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেছে। যমুনার বাবার জায়গায় নিজেকে যেন দেখতে পাই আমি। মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে বুয়ার কাজ করছে পাকিস্তানিদের ফ্ল্যাটে!

গম্ভীর গলায় বললাম, যমুনা, এই মুহূর্তে কাজটা তুমি ছেড়ে দেবে। তোমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে কাল সকালে আমার এখানে আসো। একটা সিভি নিয়ে আসতে বলবে।

যমুনার চোখে পানি এসে গেছে। চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

আমার খুব বড় ভরসার জায়গা ফরিদুর রেজা সাগর। 'ইমপ্রেস' গ্রুপের মালিকদের একজন। চ্যানেল আইয়ের এমডি। ফোন করে বললাম সাগরকে, বলল কালই পাঠিয়ে দাও।

যমুনার হাজব্যান্ডের নাম ফখরুল। ছোটখাটো দেহের অত্যন্ত নম্র বিনয়ী ছেলে। সাগর তাকে আঠারো হাজার টাকা বেতনের একটা চাকরি দিল। চাকরি পেয়ে জয়াকে নিয়ে ওরা দুজন এসে খুবই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল আমাকে।

যমুনাকে বললাম, কুড়িলের ওই দিকে আমার এক বন্ধু একটা স্কুল করেছে। আমি বলে দিচ্ছি। ওই স্কুলে তোমার একটা আয়ার চাকরি হবে। জয়াকেও ওই স্কুলে ভর্তি করে দিয়ো। বেতন লাগবে না।

সাত মাস পরের কথা।

শনিবারের এক সকালে স্বামী সন্তান নিয়ে যমুনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। এই সাত মাসে একেবারেই বদলে গেছে তার চেহারা। ফখরুল এবং তার দুজনেরই শরীরস্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। পোশাক-আশাক সুন্দর। জয়ার পরনে সুন্দর জামা। মাথার চুল বেশ বড় হয়েছে। দেখতে খুবই ভালো লাগছে বাচ্চাটিকে।

যমুনা বলল, আমরা খুব ভালো আছি স্যার। দুজনে মিলে পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার টাকা পাই। ছয় হাজার টাকা দিয়ে ছোট্ট একটা বাসা নিয়েছি। জয়া আমার সঙ্গে স্কুলে যায় আমার সঙ্গেই ফিরে আসে। আমরা খুব ভালো আছি।

শুনে ভালো লাগল। ফ্রিজ থেকে একটা ক্যান্ডি বের করে জয়ার হাতে দিলাম।

জয়া বলল, আমি একটা গান শিখেছি। শুনবে? মাত্র একটা লাইন পারি।

মজা লাগল, বললাম, শোনাও।

জয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাখির মতো মিষ্টি কণ্ঠে গাইলো 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

আমি মুগ্ধ হয়ে শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

২০১৬